হাসির বারোটা

হাসির বারোটা

লেখ ও আলেখ্য

দীপঙ্কর বিশ্বাস

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

HASIR BAROTA
Comedy

By Dipankar Biswas

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ
কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
দীপঙ্কর বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ ৩০.০০

শ্রীরাধা ও সুজাতা-কে

'হাসির বারোটা'-র বেশীরভাগ গল্প 'শুকতারা' ও 'সন্দেশে' বেরিয়েছে। তাদের সঙ্গে আরও গল্প আর ছবি জুড়ে এই সংকলন তৈরি হল।

আগের বই, 'মজানো দশ' পাঠকদের ভালোলাগার থেকেই এই দুঃসাহস। আশা রইল 'হাসির বারোটা'ও সকলের ভালো লাগবে।

অশেষ পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদারের কাছে এবং কিছু সাহায্যের জন্য শ্রীমতী মৌসুমী বিশ্বাস ও শ্রীমতী নূপুর ঘোষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত

দীপঙ্কর বিশ্বাস

এতে আছে

শকুন্তলার টিকি

বাংলা ভাষায়, দেওয়াল কথাটা ভারি ভালো। ইংরিজিতে ট্রানস্লেট করার জন্য মোটেই খাটতে হয় না। সামনের 'দে' শব্দটা তুলে দিলেই দিব্যি ইংরিজি হয়ে যায়, wall। সব বাংলা কথাগুলো যদি এমন ভদ্র হতো তাহলে আর আমাদের ট্রানস্লেশন নিয়ে অতো হিমশিম খেতে হতো না। টিফিনের সময় আলুর দম-মাখা আঙুল চাটতে চাটতে হরিকে আমার এই নতুন উপলব্ধির কথা বোঝাচ্ছিলাম। হরি একমুখ ডিমসেদ্ধ নিয়ে হুঁ হাঁ করে আমার কথায় সায় দিচ্ছিল। পাশে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে হাই-বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে স্বপন একমনে ঝিমোচ্ছিল হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে পড়তে পড়তে কোনোওরকমে টাল সামলাল।

'দারুণ মনে করিয়ে দিয়েছিস তো। আমি একদম ভুলেই গেছলাম।'

আমরা অবাক হলাম, 'তোকে আবার কী মনে করালাম?'

'একটা দারুণ জিনিস। সেজমাসির বাড়ি থেকে শিখে এসেছি।'

'কী?'

'কী করে যে ভুলে গেলাম!'

'আরে বলবি তো কী?'

'তোর দেওয়ালের কথায় মনে পড়ে গেল।'

'কি? চুনকাম করা?'

'তোর যেমন বুদ্ধি। কিন্তু কী করে যে ভুলে গেলাম!'

'বলবি তো বল, না হলে চুপ কর।'

'দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা। ইস্কুলে একটা দেওয়াল পত্রিকা বার করলে কেমন হয় বল তো?'

আমি আর হরি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। দেওয়াল পত্রিকা আমরাও দেখেছি, কিন্তু স্কুলে বার করার কথা কখনও মাথায় আসেনি। বললাম, 'ক্লাসের অন্যরা আসুক, একটু আলোচনা করে দেখা যাক।'

ছুটির পর ক্লাসের অনেকে মিলে দেওয়াল পত্রিকার কথাটা আলোচনা করলাম। অনেকেরই মত আছে। জগন্নাথ অর্থাৎ জগা আমাদের ফার্স্ট বয়। আমরা জগাকে বললাম, 'তুই থাকলে খুব সুবিধে হয়, ভাষাটাষা, বানান-টানান নিয়ে তাহলে কম ভাবতে হয়।'

জগা বলল, 'আমার আপত্তি নেই কিন্তু হেডস্যার কি মত দেবেন?'

আমরা বললাম, 'বলে দেখতে তো দোষ নেই।'

নয়ন বলল, 'তাহলে এখনই চল। এই সময় হেডস্যার একটু নিরিবিলিতে ঠাণ্ডা মেজাজে থাকেন।'

হরি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'বললেই হল। গত সাত বছরে হেডস্যারের ঠাণ্ডা মেজাজ কে দেখেছে রে?'

সত্যিই আমরা হেডস্যারকে ঠাণ্ডা মেজাজে কখনও থাকতে দেখিনি!

নয়ন বলল, 'তোরা এই সময়ে হেডস্যারকে কবে দেখেছিস? আমরা খেলাধুলোর জন্য বেশিক্ষণ থাকি বলেই দেখতে পাই। গত বছর সরস্বতী পুজোর সময়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি। চাঁদা নিতে যারা এসেছিল, সকলে এক টাকা করে পেল। খালি এই সময়টাতে যারা এসেছিল তারা ছাড়া, তারা দু-টাকা করে পেয়েছিল।'

নয়নের কথাগুলো আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও গুটি গুটি রওনা হলাম।

হেডস্যারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, কে আগে ঢুকবে তা নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছিল, হেডস্যার নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কারা?'

অগত্যা, 'আমরা স্যার' বলে জনা পাঁচছয় হেডস্যারের ঘরে সেঁধিয়ে পড়লাম। বাকিরা বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকল।

টেবিলের ওপর একরাশ পরীক্ষার খাতা ছড়ানো। খাতা থেকে মুখ তুলে একটু মুচকি হাসলেন হেডস্যার, 'বলে ফেল কী বলবে।'

আমরা হতবাক! হেডস্যারের মেজাজ সত্যিই ভালো!! এমনটা তো কক্ষনো দেখিনি!

হরি আমার কানে কানে বলল, 'নির্ঘাৎ অনেকগুলো গোল্লা পেয়েছে রে।'

জগা ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ওর ওপরেই ভার হেডস্যারের কাছে কথাটা পাড়ার। জগা বিশেষ ভণিতা না করে কথাটা পেড়ে ফেলল। আমরা যথাসম্ভব গোবেচারা গোবেচারা মুখ করে কান-টান চুলকোতে থাকলাম। দেওয়াল পত্রিকার কথা শুনে হেডস্যার একটু ভুরু কুঁচকে চেয়ারে হেলান দিলেন। আমরা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকলাম। এক্ষুণি হয়তো বলবেন, 'না! ওসবে পড়ার ক্ষতি হবে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। আমিও কদিন আগেই ভাবছিলাম, ইস্কুলে এরকম একআধটা পত্র-পত্রিকা বার করার কথা। তা, তোমরা পারবে?' হেডস্যারের মুখে মৃদু হাসি।

নিজের কানকে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হল পায়ের নিচের মাটিটা একবার টাল খেল। কেমন যেন নার্ভাস লাগল।

সাধে কী আর ফার্স্ট বয়। কী শক্ত নার্ভ রে বাবা! আমার চক্কোর কাটার আগেই শুনতে পেলাম, জগা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, 'কিছু ভাববেন না স্যার, এমন দেওয়াল পত্রিকা বার করব যে সকলের তাক লেগে যাবে। একটা কাঠের ফ্রেম তৈরি করাতে হবে। পেছন দিকটা দেওয়ালে ভালো করে আটকানো থাকবে। সামনে থাকবে একটা তারের জাল লাগানো দরজা। দুটো আলো লাগানোর ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে রাত্তিরেও সকলে পড়তে পারে।'

হেডস্যার বললেন, 'ওটা কিন্তু ক্লাসরুমের সামনে দেওয়ালে লাগানো চলবে না। তাহলে ছেলেরা ক্লাসের ফাঁকে ভিড় করবে। মেন গেটের কাছে দারোয়ানদের ঘরের সামনে যে টিনের শেডওলা দাওয়া আছে সেখানে লাগাবে।

তা কী ধরনের লেখা থাকবে? ভেবেছ কিছু?'

জগা গড়গড় করে বলে গেল, 'গল্প, কবিতা, ছবি, রচনা, খেলাধূলা সবকিছুই থাকবে। ইস্কুলে সব ধরনের লেখার লোকই আছে।'

জগাকে আমরা সম্পাদক করে দিলাম। ওই সব বানান-টানানের ঝামেলায় কে ঢুকবে! তা ছাড়া জগার হাতের লেখাটাও খাসা। দেওয়াল পত্রিকার উপযুক্ত। জগাও এক কথায় রাজী। আমরা ছজনে মিলে একটা সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি করলাম, যাদের কাজ হবে সম্পাদককে সাহায্য করা। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 'দিগন্ত' নামটাই সকলের পছন্দ হলো।

পরের দিনই আমরা ক্লাসে ক্লাসে জানিয়ে দিলাম দেওয়াল পত্রিকার কথা। মাসে মাসে বেরোবে। সকলে যেন সাধ্যমত লেখা আঁকা ছড়া কবিতা জমা দেয়। অবশ্য মনোনয়নের অধিকার একান্তই সম্পাদকমণ্ডলীর। একটা কাঠের ফ্রেম, ঠিক যেমনটি দরকার ছুতোরের কাছে অর্ডারও দেওয়া হল।

দেওয়াল পত্রিকার প্রস্তুতি বেশ ভালই এগোচ্ছিল। শুধু নিতাই একদিন একটা ব্যাগড়া তুলে বসল। বলল, 'আমি অনেক দেওয়াল পত্রিকা দেখেছি। সব পত্রিকাতেই গল্প কবিতা, ছবিটবিগুলোকে অনেক কষ্টে পাশ কাটিয়ে একটা লতানে পদ্মফুলের গাছ বাঁদিক ঘেঁষে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত উঠে যায়। ওটা কিন্তু আমাকে আঁকতে দিতে হবে।

নিতাই সকলের বন্ধু হলেও সম্পাদকমণ্ডলী হাঁ হাঁ করে উঠল, 'তুমি সেবার বুদ্ধ জয়ন্তীতে বুদ্ধদেবের ছবি এঁকে ক্লাসসুদ্ধ সকলকে যা বকুনি খাইয়েছিলে, তোমাকে আমরা আর আঁকতে দিচ্ছি না। অন্য অনেক কিছুই তো করার আছে, করো না। কেউ তো আপত্তি করেনি।'

নিতাই কিন্তু নাছোড়, 'দেওয়াল পত্রিকার নামের দু-পাশে দুটো আলপনা দেওয়া, বড় সাইজের শাঁখ থাকে, সেগুলো আঁকতে দে। তাও না দিস তো ডানদিকের কোণে যে এক সার বক উড়ে যায়, সেগুলো অন্তত আঁকতে দে।'

নিতাইয়ের হয়ে আমি একটু সাফাই গেয়েছিলাম, 'বক কিন্তু নিতাই খাসা আঁকে। আমি পষ্ট দেখেছি, ঠ্যাংওলা বক পর্যন্ত আঁকতে পারে।'

সম্পাদকমণ্ডলী কিন্তু অনড়।

নিতাই প্রথমটা গুম মেরে বসে রইল তারপর বলল, 'বয়ে গেছে তোদের বাংলা পত্রিকায় আঁকতে। ক্লাস টেনের মদনদারা একটা ইংরিজি wall magazine বার করছে, তাতেই আঁকব।' বলেই গটগট করে চলে গেল।

আমরা তখনই বুঝলাম, ক্লাস নাইনের দেখাদেখি ক্লাস টেনের ছেলেরাও একটা দেওয়াল পত্রিকা বার করছে! হেডস্যার নির্ঘাৎ আপত্তি তুলেছিলেন দ্বিতীয় পত্রিকায়, তাই অনুমতি পেতে ইংরিজি করতে হয়েছে।

জগা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতো সব ইংরিজিতে পণ্ডিত তা জানা আছে।'

নিমে বলল, 'ওদের ছবিটবিগুলো আঁকা কিন্তু অনেক সহজ। সাহেব আঁকতে হলে প্রথমেই কোট আর টাই পরিয়ে দাও, তাতে পছন্দ না হলে একটা ফেল্ট হ্যাট, আর তাও যদি বেমানান লাগে, তাহলে একটা দাড়ি। ব্যাস, হয়ে গেল। তলায় নাম বসিয়ে দাও। কে চিনতে যাচ্ছে কোন সাহেব। আমাদেরটা অনেক শক্ত। বুদ্ধজয়ন্তীতে বুদ্ধদেব আঁকলে, বুদ্ধদেবের মতন দেখতে হতেই হবে, না হলে সকলে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।'

প্রচুর লেখা আঁকা জমা পড়তে লাগল। আমরা ভাবতেই পারিনি যে স্কুলে এত প্রতিভা আছে। অবশ্য গদ্যকারের চেয়ে পদ্যকারের সংখ্যা অনেক বেশি। 'দিগন্তের' প্রথম সংখ্যার জন্য যে সমস্ত লেখা ও আঁকা মনোনীত হল তার একটা ফর্দ দিচ্ছি। একটা ছোট গল্প, গোটা পাঁচেক ছবি, যার একটা নিমের আঁকা। খুব সুন্দর। শকুন্তলা হরিণকে কী যেন খাওয়াচ্ছেন। একটা শব্দজব্দ। পনেরো লাইনের মতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। কিছু চাঞ্চল্যকর খেলার খবর। একটা প্রবন্ধ, 'হাতি কি ডাইনোসরের বংশধর?' গোটা ছয়েক ছোট কবিতা, যার গোটা দুয়েক তুলে দিচ্ছি, তোমরা খানিক স্বাদ পাবে। এ ছাড়া অনেক কাগজ হাতড়ে জগার লেখা, বর্ষার উপযুক্ত একটা দারুণ সম্পাদকীয়।

বলাকা

নীল আকাশের ওগো বলাকা,
নিবাস তোমার জানি জলাকা,
নহ মোটা নহ সরু
পার হয়ে যাও মরু
যেন জ্যামুক্ত কোনো শলাকা।

পেলে

ব্রাজিলের কোণ থেকে
দুনিয়া তোমায় খুঁজে পেলে,
ফুটবল সম্রাট
হীরের টুকরো তুমি পেলে।
গোল দাও পটাপট
কেমনে এমন অবহেলে ?

নিতাই-এর দেখাদেখি ক্লাসের আরও বেশ ক'জন ছেলে ইংরেজি wall magazine-এর দিকে চলে গেছিল। দেওয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ক্লাসে তিনটে দল গড়ে উঠল। বাংলা, ইংরিজি আর নিরপেক্ষ। নিতাই আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিল কিন্তু, পত্রিকার মারপ্যাঁচে ক'দিনেই একটা বিশাল দূরত্ব গজিয়ে উঠল।

দেওয়াল পত্রিকাটা নানা রঙে সুন্দর করে সাজানোর পর একটা কথা বোঝা গেল যে নিতাই নেহাৎ বাজে কথা বলেনি। লেখা, আঁকাগুলোকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে একটা লতানে ফুলগাছ সত্যিই দরকার, না হলে বড্ড নেড়া নেড়া দেখায়। আমাদের আর্ট ডিরেক্টর নিমে বাঁদিক ঘেঁষে তলা থেকে ওপর অবধি লতানে ফুলগাছ বসিয়ে দিল। দিগন্ত লেখাটার দু পাশে দুটো আলপনা দেওয়া শাঁখ নিমে আগেই বসিয়ে রেখেছিল।

'দিগন্তর' শুভ উদ্বোধন পয়লা আষাঢ়। দারোয়ান শিউচরণদের ঘরের সামনে টিনের চালওলা দাওয়া। সেখানে পাশাপাশি দুটো জাল লাগানো কাঠের ফ্রেম ঝুলছে। একেকটাতে দুটো করে জোরালো আলোর ব্যবস্থা। কানাঘুষোয় শুনলাম যে ইংরিজি পত্রিকাও ওই দিনই বেরোবে।

জগন্নাথ বলল, 'রেষারেষির বহরটা দেখেছিস! ক'দিন আগে বা পরে বার করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

পয়লা আষাঢ় বুধবার সকালে দুটো পত্রিকারই শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। পাশাপাশি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী 'দিগন্ত' আর 'রেনেস্যাঁস'।

আমরা উঁকি মেরে দেখলাম 'দিগন্তর' সঙ্গে তুলনা না হলেও 'রেনেস্যাঁসটা' নেহাত খারাপ হয়নি।

জগা বলল, 'আইটেমগুলো আমাদের দেখে টুকলি করেছে রে! গল্প, কবিতা, ছবি, শব্দজব্দ, জ্ঞানবিজ্ঞান!'

কথা শেষ হবার আগে ওদিক থেকে ভারি গলায় জবাব এল, 'টুকলি করতে বয়ে গেছে।' তাকিয়ে দেখি নিতাই।

পত্রিকাটায় অনেকগুলো ছবি ছিল। তার ভেতর একটা বেশ বড় সাইজের মহিলার ছবি। তলায় লেখা, 'মোনালিসা', তার তলায় নিতাই-এর সই। ছবিটা খুব চেনা লাগল। কোথায় যেন দেখেছি। যে যাই বলুক, মন্দ আঁকেনি কিন্তু নিতাই!

স্যারেরা অনেকে দেওয়াল পত্রিকা দুটোরই প্রচুর তারিফ করলেন। টিফিনের সময় লেগে গেল ছেলেদের ভিড়। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কিছু ছেলে পড়ছে আর বাকিরা পড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওদের ঘাড়ে। আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ইংরিজি পত্রিকার কর্মসচিবেরাও একই দৃশ্য উপভোগ করছে। সন্ধ্যে হতেই জোরালো আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মেন গেটের বাইরে রাস্তা থেকে আলো দেখে দু-চারজন বাইরের লোকও ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল পত্রিকার সামনে।

আমি নয়নকে বললাম, 'যাই বলিস, আমাদেরটাতে কিন্তু ভিড় অনেক বেশি।'

নয়ন মুগ্ধ গলায় উত্তর দিল, 'তা আর বলতে !'

দেওয়াল পত্রিকার উত্তেজনাটা কদিনেই অনেক কমে এল। পরের সংখ্যার প্রস্তুতি ঢিমেতালে চলল। পরের সংখ্যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আর রসদ সংগ্রহ শুরু হল।
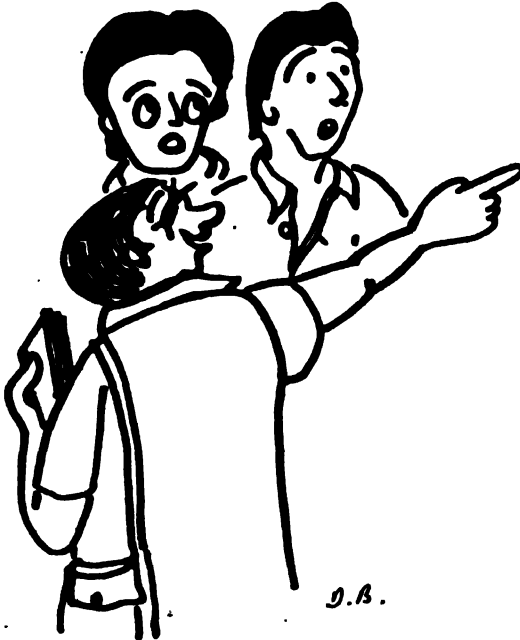
সেদিন আমি আর দুলাল ছাতা মাথায় হন্তদন্ত হয়ে ইস্কুলে ঢুকছি, আমাদের দেখেই ক্লাস এইটের চন্দ্রনাথ দৌড়ে এল, দুলালদা, তোমাদের শকুন্তলার টিকি গজিয়েছে! দেখেছ? বলেই চন্দ্রনাথ ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, 'বাজে ইয়ার্কি না মেরে ক্লাসে যা। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'ইয়ার্কি নয়। বিশ্বাস না হয় দেখে এসো।'

আমি আর দুলাল হন্তদন্ত হয়ে দেখতে গেলাম। মিথ্যে বলেনি চন্দ্রনাথ! সত্যিই, শকুন্তলার খোঁপা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে একটা টিকির মতন তৈরি করেছে! আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম টিনের চালের ফুটোটা বার করার জন্য কিন্তু নাঃ টিনের চালে ফুটো নেই। জল ওখান থেকে পড়েনি। খবর পেয়ে 'দিগন্ত'র সম্পাদকমণ্ডলীর সকলেই আগে পরে হাজির হল। দেখেশুনে সকলেই একমত, জল টিনের চাল দিয়ে পড়েনি। কেউ কেউ তো রেগেমেগে বলেই বসল, 'ওদের পত্রিকা কেউ পড়ছে না বলে আমাদেরটা নষ্ট করার মতলব।'

স্বপন বলল, 'ওইজন্যই তখন বলেছিলাম, জালের বদলে কাচ লাগাতে।'

জগা খিঁচিয়ে উঠল, 'বোকা হাতির মতন কথা বলিস না। লাইটের গরমে কাচ একদিনে ফেটে যেত!'

নয়ন আর নিমে আস্তিন গোটাতে শুরু করল, 'দাঁড়া দেখাচ্ছি, আর বাড়াবাড়ি করলে ওদের পত্রিকা ভিজিয়ে ইয়ে করে দেব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, পান্তাভাত না গোবর?'

নয়ন বলল, 'ওসব না, তারও বেশি ভিজলে যেটা হয়, মনে পড়ছে না। কিন্তু তা-ই বানিয়ে ছাড়ব।'

নিজেদের মনে গজরাতে গজরাতে যে যার ক্লাসে চলে গেলাম। ইস্কুলের পরে আবার সকলে জমায়েত হয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হল। কেউ কেউ বলল, 'শঠে শাঠ্যং, অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে ওদের পত্রিকাও ভিজিয়ে দেব।' কিন্তু বেশির ভাগই এতে আপত্তি জানাল। সম্পাদক জগা বলল, 'আরও ভাবতে হবে।'

পরের দিন টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই বাইরে এসে দেখি ক্লাস টেনের ছেলেরা, মানে

'রেনেসাঁ্যাসের' হর্তাকর্তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের চোখমুখ দেখে মনে হলো ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, কিছু একটা ঘটেছে। মদনদা এগিয়ে এল 'আমাদের ম্যাগাজিনে কে জল ছিটিয়েছে তোরা জানিস?'

জগা গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমাদের ম্যাগাজিনের জলের খবর তো তোমরাই রাখবে!'

আমাদের ক্লাসের যারা 'রেনেসাঁ্যাসের' হয়ে খেটেছিল, তারা মুহূর্তে ওদের পক্ষ নিল। ক্লাস টেনের একজন, জিবেগজার মতন দেখতে, বলল, 'কাজটা তোরা ভাল করলি না। আমরাও রাস্তা জানি।'

আস্তে আস্তে উত্তেজনা বাড়ছিল। আমরা যত বলছি জলটল আমরা দিইনি, ওরা তত শাসাচ্ছে, দেখে নেব, হ্যান করব, ত্যান করব বলে। নয়নটার মাথা গরম। হঠাৎ বলে বসল, 'বলছি তো জল দিইনি। তাও যদি বিশ্বাস না হয় তো দিয়েছি বেশ করেছি। কালকে আমাদের শকুন্তলার গায়ে জল দিয়ে টিকি করার সময় মনে ছিল না? জল কারা দিয়েছে আমরা বেশ ভাল করেই জানি।'

মদনদা আর রাগ সামলাতে পারল না। 'তবে রে' বলে নয়নের কলার চেপে ধরে একটা ঘুষি চালাল। নয়ন নিজে বক্সার। সহজেই পাশ কাটিয়ে নিল।

মুহূর্তে দুদলে ঝটাপটি লেগে গেল। কিল, চড়, ল্যাং, ঘুষি যে যাকে পারল লাগাতে থাকল। তর্কাতর্কি করতে করতে অনেকক্ষণ আগেই আমরা ক্লাসরুমের সামনে ছেড়ে মাঠের ধারে চলে এসেছিলাম। ধস্তাধস্তিতে বেশির ভাগই কাদায় সাঁতরাতে লাগল।

খবর পেয়ে স্যারেরা অনেকে, মায় হেডস্যার অবধি দৌড়ে না এলে, কাদায় গড়াগড়ি কতোদূর গড়াতো কে জানে! স্যারেদের দেখেই সকলে সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে যে 'রেনেসাঁ্যাস' আর কে যে 'দিগন্ত' ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না।

হেডস্যার পত্রিকা নির্বিচারে সকলকেই যাচ্ছেতাই করে বকুনি দিলেন। বললেন, 'ধাড়ি ছেলেদের এই বিশ্রী অসভ্যতা দেখে ছোটগুলো আর ভালো কী শিখবে? আগে জানলে আমি কখনো মত দিতাম না। কে কি করেছে আমি কিচ্ছু জানতে চাই না। যাও এক্ষুণি গিয়ে দেওয়াল পত্রিকাগুলো খুলে ফেল।'

হেডস্যারের কথা বেদবাক্য। আমাদের মাথা হেঁট। সুড়সুড় করে চলে গেলাম সাধের দেওয়াল পত্রিকা বিসর্জন দিতে।

এত দুঃখের ভেতরও ওদের দেওয়াল পত্রিকার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেয়ে গেল। মোনালিসা একেবারে আনমনা হয়ে গেছে। জলের ঝাপটায় মাথাটা ধেবড়ে ঝোলের মতন গলে পড়েছে, আমাদের শকুন্তলার বিকৃতি এর তুলনায় কিছুই না। ওদের রাগকে দোষ দেওয়া যায় না!

ক্লাসরুমের সামনে চওড়া চাতাল, তারপর সিঁড়ির তিনটে ধাপ, তারপর মাঠের আরম্ভ। স্কুলের পর আমরা দিগন্তের ক'জন, বিধ্বস্ত মন আর শরীর নিয়ে সিঁড়িতে বসে ছিলাম। কথা বিশেষ বলছিলাম না, কারণ বলার তেমন কিছুই ছিল না। বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। উন্মুক্ত নীল আকাশ।

দারোয়ান শিউচরণ তার এক বছরের মেয়ে মুন্নিকে কোলে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী হলো, অতো সোন্দর জিনিস দুটো তোমরা খুলে লিলে?'

জগা বলল, 'যেতে দাও শিউচরণ, যা হবার তা হয়ে গেছে।'

হরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বাংলা পড়ো?'

শিউচরণ একটু গর্বের হাসি হাসল, 'কুছু কুছু।'

আমি হরিকে বললাম, 'দেখেছিস, পত্রিকাটা উঠে যেতে শিউচরণের পর্যন্ত খারাপ লেগেছে।'

শিউচরণ বলল, 'মুন্নির মা দুখিয়ার অওর জ্যাদা খারাব লাগল।'

জগা বলল, 'তোমরা সকলেই বাংলা পড়ো তা কিন্তু আমরা আগে জানতাম না।'

শিউচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'মুন্নির ভিজে কাঁথা ম্যাগাজিনকে বিজলি বাত্তির উপর কিতনা জলদি শুকিয়ে যাচ্ছিল! ভগবান জানে, আজ, ইতনা বারিষমে দুখিয়া ওসব কাঁহা শুখোবে!'

হোঁচটের চোট

প্যাকিং বাক্সটার কোণে হোঁচট লেগে, ডিগবাজি খেয়েই গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'এটা কে রেখেছে এখানে? ফুটপাতের ওপর?'

প্যাকিং বাক্সের মালিক একটু আমতা আমতা করে। 'আজ্ঞে ফুটপাতেই রাখতে হল। বগলে রাখা কি সম্ভব? অত ভারি বাক্স?'

মালিকের দিকে তাকিয়ে রাগটা একটু পড়ে এল বৃদ্ধের। মাত্র বছর দশেক বয়স হবে ছোকরার।

'তুই ওই অত ভারি পেটিটা নিয়ে যাচ্ছিলি?'

'চেষ্টা তো করছিলাম কিন্তু পারছিলাম আর কই! পারলে কি আর আপনি ডিগবাজিটা খেতেন?'

কলকাতায় সদাই ভিড়। কলকাতা ভিড় জমায় আর ভিড়ই জমায় কলকাতা। ভিড়ের মাঝখান থেকে একটা মুখ জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে রে তোর বাক্সে?'

'আজ্ঞে ল্যাংড়া আম। খাসা কাশীর ল্যাংড়া।' জবাব দেয় ছোকরা।

ল্যাংড়া আমের গন্ধে আরেকটা মুখ বেরিয়ে এল ভিড় ঠেলে। 'দুঃখ থাকত না দাদু। হোঁচট খেয়ে ল্যাংড়া হলে, আজীবন ভাবতেন কাশীর ল্যাংড়ার চোটেই ল্যাংড়া।'

আরেকজন বলল, 'দাদুর কী খারাপ কপাল, প্যাকিং বাক্স থেকে কোথায় ল্যাংড়া আম খাবেন তা না, খেলেন ল্যাং।'

এক ধরনের উপকারী মুখ কলকাতার ট্রাম, বাস, ভিড়-ভাট্টা সব জায়গায়ই দু-চার পিস দেখা যায় সেরকম একজন এগিয়ে এলো, 'অতো বড়ো বাক্স কি তুই কখনও নিয়ে যেতে পারিস?'

ছেলেটা কাঁদো কাঁদো, 'নিয়ে তো যেতেই হবে. নইলে চলবে কী করে?'

'কী অন্যায় বলুন তো দাদা? পুলিসের এদের লক আপ করা উচিত।'

'কেন দাদা, বাচ্চাটার কী দোষ? বেচারা দম নিতে বাক্সটা ফুটপাতে নামিয়েছে বইতো নয়। দাদুর যদি চোখ খারাপ থাকে আর হোঁচট খায়, তা ও কী করবে? ওকে পুলিসের লক আপ করার কথা আপনি ভাবলেন কী করে? ছিঃ!'

উপকারী মুখটা সমানে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে ফুরসত পেল। 'আহা ওকে বলছি না। লক আপ করতে বলছি সেই সব মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের, যারা এই কচি কোমল শিশুদের শোষণ করে নিজেদের আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে.....'

আগের ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন, 'ঠিক বলেছেন দাদা, এইসব অসামাজিক দুশমনদের ধরে ধরে খুন করা উচিত।'

আরেকজন বলল, 'এই বুড়োটার কাণ্ডটাই দেখুন না। ওইটুকু বাচ্চা, তার ল্যাংড়া আমে ল্যাং মারছে। এই বয়সেও চোখে তো দেখেই না, আক্কেলও নেই।'

খুন, দুশমন, শোষণ, ল্যাংড়া আম, এইসব কথাগুলো ভিড়টাকে নিমেষে অনেক বাড়িয়ে দিল। যারা ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ভিড়তে পারেনি তারা দূর থেকেই দুয়েকটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিল। একজন বলল, 'নিজেরা না পারেন তো দমকলে খবর দিলেই হয়?'

ভিড়ের বাইরে থেকেই আরেকজন জিজ্ঞেস করল, 'মেট্রোরেলের গর্তে পড়েছে নির্ঘাৎ। গর্তটা কি খুব ডীপ নাকি দাদা?' হোঁচট খাওয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এবার সমবেত জনতা তেড়ে উঠল, 'ছিঃ, লজ্জা করে না ওইটুকু কচি ছেলের আমে হোঁচট খেতে? কতোগুলো আম যে চটকে গেল তা ভগবানই জানে। কৈফিয়ত তো ও বেচারাকেই দিতে হবে। ওনার আর কি!'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর থাকতে পারলেন না, 'অত দরদ তো শুধু শুকনো কথায় কেন? ঘাড়ে করে বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে এলেই হয়?'

আরও ক'টা লোক বৃদ্ধের পক্ষ নিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানা আছে, মুখেই যত দরদ কাজের বেলায় টুঁ টুঁ।'

'কি বললেন? শুধু মুখে? আপনার লোক চিনতে ঢের বাকি আছে মশাই।' সেই উপকারী মুখটা আবার নড়ে উঠল, 'মদন...., এই মদন।'

মদন নামের লোকটা ভিড় ঠেলে বদন বাড়িয়ে দিল, 'ডাকছিস কেন রে ফেলু?'

'চল তো এই পুঁচকেটার বাক্সটা পৌঁছে দিই। বেচারা টানতে পারছে না। মিনিট কয়েক লাগবে মনে হয়।'

মদনের চেহারাটা দেখার মতন। আগে কেউ খেয়াল করেনি কিন্তু এবার সবাই তাকিয়ে রইল। একসাইজ করা বিশাল চেহারা। কোথাও গোলা কোথাও গুলি কিলবিল করছে। হাফ হাতা শার্টটা যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে।

ফেলু ছোকরাকে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কত দূরে নিয়ে যেতে হবে ভাই?'

ছোকরা বলল, 'ওই তো ট্রাম রাস্তাটা পার হয়ে ওদিকে মোটে পঞ্চাশ গজ হবে।'

ফেলু নিচু হয়ে বাক্সটা তুলতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'আজ্ঞে পাঁচু।'

'নাঃ, বেশ ভারি বাক্স। একা পারা যাবে না। তোমাকেও হাত লাগাতে হবে পাঁচু।'

ফেলু পাঁচুর দিকে তাকাল। মদন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিল ফেলুদের বাক্স তোলা, হঠাৎ হাহা করে একটা অট্টহাসি হেসে উঠল। মদনের হাসির তালে তালে বুশশার্টের দুটো বোতাম পট পট করে ছিঁড়ে ঠিকরে পড়ল।

মদন ফেলুকে বলল, 'এইজন্যেই বলি রোজ সকালে খানিকটা আদাছোলা খেয়ে ডনবৈঠক দিবি। তুমিও শুনে রাখো খোকা, ছ মাস অমনটা করলে ওই বাক্স নিয়ে আর হিমসিম খেতে হবে না।'

মদন হাফহাতা জামার আস্তিনটা আর একটু গুটিয়ে হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করলো। 'এটা কি বলো তো পাঁচু? দিব্যি টিপে টুপে বলবে।'

পাঁচু পুলকিত নেত্রে তাকিয়ে ছিল মদনের আস্তিনের দিকে। বেশ ভাল করে টিপে টিপে পরখ করে বলল, 'দারুণ বানিয়েছেন দাদা। হাতের ভেতর আস্ত নারকোল। অন্য হাতেও আছে নাকি?'

মদন বেশ গর্বিত হয়ে অন্য হাত আর হাতা দুটোই গোটায়, 'নারকোল নয়। এটা হল মাস্‌ল। একে বলে বাইসেপ। একসাইজে হয়।'

পাঁচু বলল, 'একসাইজের কিন্তু মনে হল না। অন্য হাতটা আবার দেখি?'

মদন আগের হাতটাও গুটিয়ে দেখাল, 'একসাইজ ছাড়া এমন হয় কখনো?'

পাঁচুর মানসিক বিবাদ ভঞ্জন হল। একসাইজেরই বটে । গাছের ডালের মতন এলোমেলো না। কিন্তু গাছের ডালের মতনই শক্ত। 'একটু ঝুলে দেখবো? কেমন লাগে মদনদা?' সম্মতির অপেক্ষা না রেখে টুপ করে ঝুলে পড়ল পাঁচু, 'দিব্যি দোল খাওয়া যায়।'

'আরে তোমার মতন পাঁচটা পাঁচু দুললেও টস্‌কাবে না।'

বাচ্চারা একই রকম। একজন দুললে সকলেই দুলতে চায়। ভিড়ের মধ্যে দুই ভদ্রলোকের কোলে দুটো বাচ্চা, বায়না ধরল তারা দুলবে। মদন, পাঁচু-দোলানো হাতটা বাড়িয়ে দিল, 'দোল না খুব, যত চাও। প্রাণ খুলে দোল খাও।'

একটু দুলেই পাঁচু বলল, 'বাবাঃ হাঁফিয়ে গেলাম।'

অন্য দুলন্তদের একজন বলল, 'বাবা একে আমাদের বাড়ি ঝুলনের দিন আসতে বলবে? আমাদের কড়িকাঠ থেকে দোলনা ঝোলানো বড্ড ঝামেলার।'

অন্য দুলন্ত শুধোয়, 'এদেরই মুস্‌কো পালোয়ান বলে। তাই না বাবা?'

বাবা ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হলেন। কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে তোতলাতে থাকলেন, 'মিনু তোমায় কতবার বলেছি না, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, পালোয়ানকে পালোয়ান বলতে নেই।' বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না মদন, 'তা যাই বলুন দাদা, এমনটা থাকলে ওইটুকুন বাক্স নিয়ে ফেলুটার মতন হাঁচড় পাঁচড় করতে হত না। দেখবেন?'

চারপাশের জনতা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। মদন কারও সম্মতির অপেক্ষা না রেখে বড়ো বাক্সটা এক ঝটকায় একরকম ট্যাকেই তুলে নিল। দেখে সকলে অবাক। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠল।

পাঁচু বলল, 'দারুণ দিলেন মদনদা। ঠিক সার্কাসের মতন, কিন্তু.......'

ফেলু জিজ্ঞেস করে, 'আবার কিন্তু কিসের?'

'আজ্ঞে আরেকটা বাক্স যে আছে।' পাঁচু দেখিয়ে দিল একটু দূরে ম্যাগাজিন স্টলের কাছে একইরকম আরেকটা বাক্স।

ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে এসেছে। এতক্ষণে মোটামুটি সকলেই পাঁচুর দলে। হোঁচটখাওয়া ভদ্রলোকই বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, ওইটুকু দুধের বাচ্চাকে ওরকম দুদুটো ধাড়ি বাক্স কেউ বইতে দেয়? পশু, না জানোয়ার, না পিশাচ।'

'আপনি কিছু ভাববেন না দাদু। ওর মালিকটাকে আমরা এক্ষুণি শাসিয়ে আসছি। আর যেন এমন না করে।'

ফেলু বলল, 'পাঁচু ধরো তো ভাই ও দিকটা, এই বাক্সটা আমরা দুজনে দিব্যি নিয়ে যেতে পারব।'

ঘরটা ছোট্ট। ফলের গুদোম গোছের কিছু হবে। নানারকম প্যাকিং বাক্স, টুকরি, ঝুড়িতে বোঝাই। মাঝখানে একটা তক্তপোশে বসে এক ভদ্রলোক নাকে চশমা ঝুলিয়ে একটা ক্যাশবাক্সের ওপর হিসাব কষছেন। দরজা দিয়ে ঢুকে তক্তপোশে পৌঁছানোর রাস্তাটুকু ছাড়া সব মালে বোঝাই। ঘরে ঢুকেই ফেলু তক্তপোশের ওপর বসে হুসহাস করে হাঁপাতে লাগল। ভদ্রলোক মুখ তুললেন।

মদন তেড়ে যেতে যাচ্ছিল কিন্তু মাঝখানে পাঁচু বাধা দিল। তক্তপোশটা একটু তুলে ধরবেন মদনদা। বাক্সগুলো তলায় ঢুকিয়ে দিই। ভদ্রলোক তক্তপোশ থেকে নামতে যাচ্ছিলেন। মদন ' দরকার নেই' বলেই তক্তপোশটা তুলে ধরল। পাঁচু বাক্স দুটো ঠেলে পুরে দিল তক্তপোশের তলায়।

কাজ শেষ। মদন কোমরে হাত দিয়ে বেশ চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো ভদ্রলোককে, 'আপনি কী মনে করেছেনটা কী?'

ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কী?'

ফেলু বলল, 'নেহাত গবেট, কি মনে করেছে তাইই জানে না।'

মদন বলল, 'ওসব ন্যাকামো ছেড়ে পরিষ্কার বলুন তো, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন ওই পুঁচকে ছোঁড়া ওরকম দু-দুটো বড় বাক্স বয়ে আনতে পারবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে না।'

ফেলু আর মদন মরিয়া, 'আপনি ওকে বাক্স দুটো বয়ে আনতে পাঠাননি?'

'আজ্ঞে না। ওইটুকু ছোঁড়া কখনও পারে? আপনারাই বলুন না।'

মদন আর ফেলু দুজনেরই কেমন সব গুলিয়ে গেল, 'ওঃ' বলে মদন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আজ সকালে আমের লরিটাকে পুলিস এখানে দাঁড়াতে দেয়নি। মুটেরা বলল, ওই অদ্দুর থেকে দশটা বাক্স বয়ে আনতে তিনটাকা করে তিরিশটাকা লাগবে। ওই প্যাংলা পাঁচুটাই তো বলল, 'বেকার তিরিশটাকা খরচ করবে কেন বাবা? আমায় দশটাকা দাও আমি সব মাল ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি।' আমি অনেক বারণ করেছিলাম। কিন্তু কাজের ছেলে মশাই। এই দুটো নিয়ে দশটা বাক্সই ঘরে পুরে দিলে। কি বিচ্ছু ছেলে ভাবুন! যখন জিজ্ঞেস করলাম তুই কী করে পারবি। কী বলল জানেন? 'লরির কুলিবা তো ফুটপাতে নামিয়েই দেবে। তারপর এইটুকু বয়ে দেবার মতন বুদ্ধু আর উজবুক শ্যামবাজারের মোড়ে সর্বদাই প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই পেছন ফিরে মদন আর ফেলু দেখল পাঁচু অনেক দূরে, নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে একছড়া কলা খাচ্ছে আর খিকখিক করে হাসছে।

'তবেরে' বলে তার দিকে ছুটে যেতেই, 'একটা কলা খাবেন মদনদা—!' বলে পাঁচু এক ছুটে একটা সরু গলিতে মিলিয়ে গেল।

মেজদাদার মেধা

মেজদা কিন্তু ছেলেবেলায় কোনওদিনই পড়াশোনায় ভালো ছিল না। ভালো থা
তো দূরের কথা, মেজদার মাথায় কিছু ঢুকতোই না। কোনওরকমে টেনেটুনে অ
বাড়ির গুডউইলের জোরে ক্লাসে উঠতো। মেজদা ক্লাস থ্রীতে পাঁচের নামতা বল
মুখ আমতা আমতা করে কান চুলকোত। ক্লাস সিক্সে হিস্টরি খাতায় বাবরের ছে
নাম হুমায়ুন না লিখে লিখেছিল হনুমান। ক্লাস নাইনে নতুন জ্যামিতি শিখেই মেজ
hypotenuse -কে hippopotamus বলে ঝাড়া তিনঘণ্টা একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাক
রেকর্ড করেছিল।

বাড়ির সকলে বলত রমাকে দেখে শিখতে পারিসনা অজু! তোর চেয়ে এ
বছরের ছোট হলে কী হয়, এক ক্লাসে পড়ে। ছোড়দিকে দেখে সত্যিই শেখার ছি

বাবরের ছেলে হুমায়ুন তো ছেলেখেলা ঔরংজেবের ছেলের নাম পর্যন্ত ঝাড়া মুখস্থ। Hypotenuse -কে কক্‌খনো ভুল করেও hipp opotamus বলে ফেলত না। গড়গড়িয়ে দশের নামতা বলত। একবারই শুধু ছোড়দি জোয়ানের আরক আর জোয়ান অফ আর্কে গুলিয়ে ফেলেছিল। তাও ঘুমচোখে। ওটা গুলিয়ে যেতেই পারে। এক জোয়ান থেকে আরক হয়। আরেক আরক থেকে জোয়ান। মেজদাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই চিন্তা ছিল, কিন্তু মেজদার তেমন মাথাব্যথা ছিল না। অবশ্য সকলে তখন একরকম ধরেই নিয়েছিল যে মেজদার মাথায় ব্যথা করার মতন কিছু নেই। অত নিরেট জিনিসে ব্যথা জাগে না। মেজদা নিজের আড্ডা নিয়েই মশগুল ছিল। মেজদার নাপিত বন্ধু ছিল। চুল কাটতে পয়সা লাগত না। জামাকাপড় কাচতে, দাঁত তুলতে, সাইকেল সারাতে কিছুতেই পয়সা লাগতো না মেজদার। ওর সবরকমের বন্ধুই ছিল একমাত্র পড়াশোনার ছাড়া।

মেজদা আসল কেরামতিগুলো দেখাল যখন টেনে উঠল। টেনে উঠলই বলা উচিত অবশ্য আরও খুলে বললে টেনেটুনেও বলা চলে।

একদিন বিজ্ঞানের স্যার নিশানাথবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মেজদা দাঁড়িয়ে উঠে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করল, 'স্যার আইজ্যাক নিউইটনই প্রথম গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করেন। গ্র্যাভিটির সাহায্যে খুব সহজেই আপেল পাড়া যায়। গ্র্যাভিটি ইংলণ্ডে পাওয়া যায়। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে যখন আপেলের মরশুম ঠিক তখনই ইংলণ্ডে প্রচুর গ্র্যাভিটি দেখা দেয়।'

মেজদার কথায় নিশানাথবাবুর মুখটা হঠাৎই থমথমে হয়ে উঠল। মুখের ভাঁজগুলোতে টান পড়ল। নিশানাথবাবু মেজদাকে কাছে ডেকে না পাঠিয়ে নিজে নেমে এলেন ধীর পদে, মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে, মেজদার দিকে। হাতে লিকলিকে বেত।

মেজদা এক্সাইজ করে। নিশানাথবাবুর হাতের জোরও মন্দ না। বেচারা বেত্ দুখানা থেকে চারখানা হল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হাসি চাপতে পারল না। নিশানাথবাবু বুঝলেন, তাঁর কার্যকলাপেই ছেলেরা হাসছে। নিশানাথবাবু লাফিয়ে উঠে আর্তনাদ করলেন— 'আমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছি, তাই ভুল শুনেছি। আর যদি ঠিক শুনে থাকি তো এক্ষুণি পাগল হয়ে যাব।' মুহূর্তের জন্য থামলেন নিশানাথবাবু, তারপর 'আঁ, আঁ' শব্দে পরিত্রাহি চিৎকার করে রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন হেডস্যারের ঘরের দিকে।

হেডস্যারের ঘর মাঠ পেরিয়ে। ইস্কুলের মাঠে একটা নির্বিবাদি ষাঁড় প্রতিদিনের মতন অন্যমনস্ক হয়ে ঘাস চিবোচ্ছিল। নিশানাথবাবু সপাটে আছড়ে পড়লেন ষাঁড়ের মাঝবরাবর। আচমকা আঘাতে ষাঁড়টা একটা ছোট্ট 'ওঁক' করেই লেজ তুলে লাগাল দৌড়। ইস্কুলের দেহাতি দারোয়ান শিউচরণ মইয়ে চড়ে একটা আলোর কাটা বাল্ব পাল্টাচ্ছিল। ষাঁড়টা যে কেন ওইখানটাই নিরাপদ ভাবল কে জানে (শিউচরণ হয়তো ষাঁড়টার অনেক দিনের চেনা) সে পালানোর রাস্তাটা ঠিক করল মইয়ের কাছে দিয়ে।

শিউচরণ ভক্ত মানুষ। আচমকা মই সরে যাওয়াতেও রামজিকে সে ভোলেনি। দুটো ডিগবাজির সঙ্গে দুটো 'রাম কহো' বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। রামই জান মান সব রাখলেন শিউচরণের। টপাস করে পুঁটলির মতন বসিয়ে দিলেন ষাঁড়ের পিঠে। নইলে একটা পা অন্তত ভাঙতোই ভাঙতো। ষাঁড়টা আরও সাতগুণ ভয় পেয়ে তিনগুণ জোরে দৌড়ে ফটক দিয়ে বেরোতে গিয়ে দরজা টরজা সব গুলিয়ে ফেলে একটা মোক্ষম গুঁতো লাগাল সামনের দেওয়ালে। একটা ইট খসে পড়ল মাটিতে। ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে।

হৈ-হৈ করে বাকি দারোয়ান আর তাদের বন্ধুরা ছুটে এল। বেগতিক দেখে মেজদা দিল পিঠটান। বাড়ি ফিরে 'পেট কামড়াচ্ছে' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত দশটার সময় ইস্কুলের সব দারোয়ানেরা বাড়িতে এসে হাজির। মেজদা দৌড়ে পালাতে গেল কিন্তু লীলারাম মেজদাকে ধরে ফেলে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল। জানা গেল দারোয়ানদের মতে শিউচরণই সাক্ষাৎ শিউজি। শিউজি ছাড়া আর কেউই অত জোরে ষাঁড়ে চড়তে পারে না। দারোয়ান আর তাদের বন্ধুবান্ধবেরা শিউচরণকে সারা সন্ধে, সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে পুজো করেছে। সাক্ষাৎ শিউজিকে খুঁজে বার করার জন্য ওরা মেজদাকে দিতে এসেছে অভিনন্দনের সঙ্গে এক বাক্স লাড্ডু।

বড়দির বিয়ের সময় এক কাণ্ড বাধাল মেজদা, বাড়ির সবাই ভারি ব্যস্ত। দাদা দিদিদের সকলকে ইস্কুল থেকে কদিনের ছুটি নিতে হবে। ছুটি নেওয়া মানেই চিঠি লেখা। আর চিঠি মানেই ইংরিজি। বড়োদের সময় নেই লিখে দেবার। ছোড়দি বলল. 'কুছ পরোয়া নেই, আমার চিঠি আমি নিজে লিখে নেব।'

মেজদা চিঠিটা লিখিয়ে নেবার জন্য একটু ছোড়দির গা ঘেঁষে এসেছিল, কিন্তু ছোড়দি বলল, 'আমার বয়ে গেছে লিখে দিতে, নিজের চিঠি নিজে লেখ। সেদিন 'ক্লাউনের মতন দেখাচ্ছে' বলার সময় মনে ছিল না!'

মেজদা বলল, 'যা যা। ওরকম একটা ইংরিজিতে চিঠি লিখে দেবার লোক আমার বহুত্ আছে। তা ছাড়া আমি নিজে লিখতে জানি না নাকি! একটু ভাবতে হবে এই যা।'

একটু পরে মেজদাদের ঘরে গিয়ে দেখি মেজদা সেজমামার একটা কোট আর দাদুর একটা ফেল্ট হ্যাট মাথায় দিয়ে একমনে পায়চারি করছে। আমি সর্বদাই মেজদার দলে। ছোড়দির কথায় আমারও মেজাজটা চড়ে গিয়েছিল। আমি মেজদাকে বললাম 'তুমিও একহাত দেখিয়ে দাও তো মেজদা।'

মেজদা গম্ভীরভাবে বলল, 'সেই চেষ্টাই তো করছি। আমার তো জানিসই একটু সাহেবিয়ানা ছাড়া শেক্সপিয়ার মার্কা ইংরিজি বেরোয় না।'

আমি উৎসাহ দিলাম, 'বাবার একজোড়া বুট এনে দেব? একটা চুরুট? এমন একখানা চিঠি লিখতে হবে, যা সবার মনে থাকবে চিরকাল।'

আমার কথা রেখেছিল মেজদা। সারাদিন খেটে, গ্রামার বই ঘেঁটে ঘরের ভেতর হেঁটে, ইংরিজিতে, ছুটির প্রার্থনা ভরা আবেদন জানিয়েছিল হেডস্যারকে।

হেডস্যার মাঝবয়সী ব্যাচেলার মানুষ। মেজাজটি বাঘাটে। থাকেন ইস্কুলের চৌহদ্দিতে। কোয়ার্টারে।

মেজদা ইস্কুল বসার আগে হেডস্যারের ঘরে উঁকি মেরে দেখল হেডস্যার তখনও আসেননি। খামেভরা চিঠিটা মেজদা রেখে এল টেবিলের সামনে, যাতে চেয়ারে বসলেই নজরে পড়ে।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের মাঝামাঝি হেডস্যারের বেয়ারা ফকিরচাঁদ এসে মেজদাকে ডেকে নিয়ে গেল হেডস্যারের ঘরে। মেজদার তো প্রাণ গেল উড়ে।

হেডস্যারের ডাক মানে রয়েল বেঙ্গলের ডাক। ছুটির দরখাস্তে এতো হাঁকডাকের কী আছে রে বাবা! মেজদা চলল দুরুদুরু বক্ষে। হেডস্যারের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই কিন্তু মেজদার মনটা শান্ত হল। হেডস্যারের স্নিগ্ধ মুখের ওপর একটা আলগা হাসির প্রলেপ। মেজদাকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে হেডস্যার ফকিরচাঁদকে একটা কাজে পাঠালেন। হেডস্যারের ঘরে এমন আপ্যায়নের আশা মেজদা কখনোই করেনি, কুণ্ঠিত মেজদা একটু হকচকিয়ে সামনের চেয়ারে আধবসা হল।

হেডস্যার মৃদু হাসলেন 'তোমার চিঠি পড়লাম। প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখতে হবে।'

মেজদা একটু বিষম খেল, —'আজ্ঞে'

"তোমার বড়দির সাথে বিয়ের সম্বন্ধের কথা, ছুটির দিনে তোমরা পাড়তে আসবে" —'একটু থামলেন হেডস্যার। তাকালেন ক্যালেণ্ডারের দিকে "সেটা — সামনের মাসে হলেই ভালো হয়— বৈশাখ মাসটাই....." মেজদা খটাং করে জিব কামড়ে ফেলল। মাথা গেল ঘুরে। চেয়ারে না বসে থাকলে চিৎপটাং হয়ে মাটিতে ঠিকরে পড়ত। চোখের সামনের সর্ষে ফুলেরা একটু ম্লান হয়ে এলে মেজদা খুব বিনীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার বড়দির বিয়ের তো ঠিক হয়ে গেছে। আমি শুধু ছুটির জন্য অ্যাপলিকেশন করেছি।'

কুড়ি সেকন্ডের ভেতর একটা মানুষের মুখের যে এতো পরিবর্তন ঘটতে পারে তা হেডস্যারকে না দেখলে জানা যেত না। হেডস্যারের মুখটা বেগুনী হয়ে উঠল, বোতামগুলো পটপট করে ছিঁড়ে পড়ল। নাকের পাটা ফুলে ফোঁসফোঁস করে স্টীম ইঞ্জিনের মতন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, হেডস্যার তিনটে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতন গর্জন করে উঠলেন, 'মস্করা....আমার সঙ্গে মস্করা.....'

হেডস্যার আর কি বলেছিলেন মেজদা তা জানতে পারেনি। মেজদা হেডস্যারের ঘর থেকে নিজে বেরিয়েছিল, নাকি লোকে ধরাধরি করে বের করেছিল তাও মেজদার মনে নেই। মানসিক আঘাতে মেজদা বড়দির বিয়েটা কাটালে বিছানায় শুয়ে। আর মেজদার চিঠির আঘাতে হেডস্যারের ব্লাডপ্রেসার এতো বেড়েছিল যে তিনিও বাধ্য হয়েছিলেন ক'দিনের জন্য বিছানায় শুতে। সেই মেজদা যে রাতারাতি এমন পাল্টে যাবে কে জানতো!

ইস্কুল থেকে মেজদার নাম কাটানোর ইচ্ছে সব স্যারেদেরই ছিল কিন্তু মুখ ফুটে কেউই সেকথা বলতে সাহস করত না। কারণটা ছোটকা।
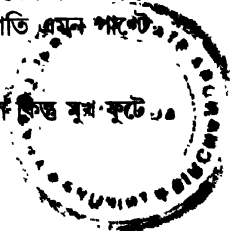
ছোটকা তখন ওখানকার M. L. A.। দোর্দণ্ড প্রতাপ। ছোটকা স্কুলের গভর্নিং বডির মেম্বার। ওর সুবাদে ইস্কুল এক কাঁড়ি টাকা পায়। মেজদা ছোটকার পেয়ারের লোক। সব ফাইফরমাস খাটে। ছোটকাও অজু বলতে অজ্ঞান। স্যারেরা একআধবার খুবই বিনীতভাবে মেজদার কথাটা পেড়েছিলেন ছোটকার কাছে, কিন্তু ছোটকা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে মেজদাকে স্কুলের গণ্ডী পার করার দায়িত্ব স্যারেদের। মেজদার মাধ্যমিকের রেজাল্ট খারাপ হলে ইস্কুলের গ্রান্ট নিয়ে টানাটানি পড়বে।

স্যারেরা পড়লেন বিরাট ফাঁপরে। বুঝলেন কী ঘটতে চলেছে। বছরের পর বছর মাধ্যমিকের দেওয়ালে হোঁচট খেয়ে ইস্কুলের বটগাছটার মত মেজদা থেকে যাবে স্কুল প্রাঙ্গণে, আর থেকে থেকে স্যারেদের পিলে চমকে দেবে।

হেডস্যার গোপন সভা ডাকলেন। স্যারেদের বললেন, একটাউপায়ের কথা ভাবতে। কমবয়সী স্যারেদের দুজন সাহস করে এগিয়ে এলেন। অঙ্কের অমিতবাবু আর ইংরিজির বিজয়বাবু জানালেন ইস্কুল আর স্যারেদের মান আর টাকা বাড়ানোর জন্য শহীদ হতে তাঁরা প্রস্তুত। অজয় অঙ্ক আর ইংরিজিতেই সবচেয়ে কাঁচা। একেবারে কচি, সবুজের মতন অবুঝ। সপ্তাহে দুদিন করে সন্ধেবেলা ওঁরা পড়াবেন অজয়কে। দুজনেই প্রচুর ব্যায়াম করেন আর ছোলা খান। মনে হয়না ওঁদের তেমন ক্ষতি হবে।

বাবা স্যারেদের প্রস্তাবে ভীষণই খুশি হল। টাকার কথা পাড়তে অমিতবাবু আর বিজয়বাবু জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ! কী যে বলেন, এমন কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেরাই কৃতার্থ বোধ করছি।'

বাবা বলল, 'অজয়কে আপনারা প্রয়োজনে চড়টা চাপড়টা দিতে কসুর করবেন না।'

'সে আপনি ভাববেন না', বললেন স্যারেরা। 'আমাদের শরীর বেশ মজবুত।'

বাবা বলল, 'খেয়াল রাখবেন অজয়ও এক্সাইজ করে কিন্তু।'

স্যারেরা চলে যেতে বাবা মেজদাকে ডেকে সকলের সামনে কড়া গলায় সোজাসুজি শাসিয়ে দিল। 'বিজয়বাবু আর অমিতবাবু তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে পড়াতে আসছেন—তোমায় পড়াতে ওঁদের যদি কোনও রকম অসুবিধে হয়, মানে কারো যদি মাথা ঘোরে, পিলে চমকায়, দাঁতকপাটি লাগে, বুক ধড়ফড় করে বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহলে তোমার মাথা আমি ভাঙব।'

মেজদার তেমন ভাবান্তর দেখা গেল না। পোষা বৌঁজিটাকে যেমন ছোলা খাওয়াচ্ছিল তেমন খাওয়াতেই লাগল।

[illegible] দিনই বেড়াতে চলে গেল বড়দির বাড়ি কল্যাণীতে। বলে গেল, 'পনের দিন পরে [illegible] এসে যেন পড়া এগিয়েছে দেখি।'

[illegible] অমিতবাবু যেদিন প্রথম এলেন সেদিন কিন্তু ঘরের বাইরে থেকে সবকিছু [illegible] লাগল। মা আমাকে বলল. অমিতবাবকে চা আর বিস্কুট দিয়ে

আসতে। চা-বিস্কুট হাতে ঘরে ঢুকে দেখি ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুরুচরণ। অমিতবাবু জামার হাতা গুটিয়ে ভুরু কুঁচকে পেছনের আলমারিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মেজদা সামনে খোলা খাতার দিকে তাকিয়ে একমনে পেন্সিল চিবোচ্ছে আর মাথা চুলকোচ্ছে। আমি পা টিপেটিপে যেমন ঢুকেছিলাম তেমনই বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা পাশের ঘর থেকে মৃদু তবলা বাজানোর মতন আওয়াজ শুনলাম। মেজদি বলল, 'অজুর অঙ্কের স্যার কি তবলাও বাজান নাকি?'

পরদিন এলেন বিজয়বাবু। চা দিতে গিয়ে দেখি বিজয়বাবু ভুরু কুঁচকে চোখ বুজে আলমারিতে হেলান দিয়ে একমনে শুনছেন আর মেজদা প্রায় গড়গড় করে ইংরিজি পড়ে চলেছে একটা বই থেকে। বিজয়বাবুর জামার হাতা কিন্তু হাতাহাতির প্রস্তুতিতে গোটানো না। সেদিন আমরা পাশের ঘর থেকে মশা মারার মতন মৃদু চড়-চাপড়ের বেশী আওয়াজ পেলাম না। সেই আমরা প্রথম বুঝলাম যে মেজদা অঙ্কের চেয়ে ইংরিজিতে ভালো।

সপ্তাহটা প্রায় নির্বিঘ্নে কেটে এসেছিল কিন্তু শাস্ত্রে বলে শনিবারের দিনটা খারাপ। শনিবারটা কাটল না।

আমরা যে যার পড়া করছিলাম। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। হঠাৎ মেজদার পড়ার ঘর থেকে একটা ঝটাপটির আওয়াজের সঙ্গে একটা দমাস করে শব্দ আর অমিতবাবুর 'বাবাগো' ভেসে আসাতে আমরা খেয়াল করতে বাধ্য হলাম। ছোটখাটো ধুপধাপ দুমদাম হলে যথারীতি পাত্তা দিতাম না।

সকলে মেজদার ঘরে ঢুকে দেখি অমিতবাবু হাত পা এলিয়ে শিবনেত্র হয়ে চেয়ারে বসে। মাঝারি সাইজের কুলের আচারের হাঁড়িটা ভেঙে ছত্রাকার। হাঁড়িটা সাধারণত

আস্ত অবস্থায় আলমারির মাথায়ই থাকে। অমিতবাবুর সর্বাঙ্গে এদিক ওদিক বেশ কিছু টোপাকুল।

মা গিয়ে সটান মেজদার কান ধরল, 'এতোবড়ো আস্পর্ধা মাস্টারের গায়ে হাত তুলিস—'

মেজদা নির্বিকার গলায় বলল, 'কি যা তা বলছ। স্যারই তো আমায় মারধর করলেন, আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছি। তারপর ধড়াস করে আলমারিতে হেলান দিয়ে বসতেই তো হাঁড়িটা মাথায় পড়ল। আমার কী দোষ? বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ।'

অমিতবাবু কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন তারপর উঠে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ছাতাটা বগলে ফেলে চটি পায়ে বেরিয়ে গেলেন। কাউকে কিছু না বলে।

পাঁচদিন বাদে বিজয়বাবুকে নিয়ে ঠিক একই রকম হট্টগোল। আবার আমরা সকলে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম। বিজয়বাবু মুখটাকে বিকৃত করে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মুঠোটাকে চেপে ধরে বসে আছেন। মা এগিয়ে গিয়ে আবার মেজদার কান ধরল। কিছু বলার আগে মেজদাই জানাল, 'স্যার যদি সজোরে দেওয়ালে ঘুষি মারেন সেটাও কি আমার দোষ? আমি তো শুধু একটু সরে গেছি।'

বিজয়বাবু বিদায় নিলেন।

বাবার ফেরার কথাই ছিল সেদিন বড়দির বাড়ি থেকে। বাবা ফিরল কিছুক্ষণ পরে। হাতে একটা বিশাল নারকেল। মেজাজ শরিফ। ঘরে আমরা সকলেই ছিলাম। বাবা নারকেলটা দেখিয়ে মাকে বলল, 'দেখেছ খেঁদি আমাকে কি দিয়েছে—'

মা বলল, 'কী আবার, নারকেল।'

'যে সে নারকেল নয়, চিনিমুখো নারকেল গাছের প্রথম ফল। দশ বছর অপেক্ষার ফল। এই নারকেল সামনের ভীম একাদশীতে খেলে শরীর মনের সব অশান্তি চলে যাবে। তা অজয়ের পড়া কেমন চলছে, দুজনেই এখনও টিকে আছেন না....'

মেজদা মাথা নীচু করল।

বাবা মেজদাকে চেনে। 'জিজ্ঞেস করল, দু'জনেই!'

মেজদা মাথা তুলল না। মা কথাটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্য বলতে যাচ্ছিল, 'খেঁদিকে....'

'থামো।' বলে মাকে থামিয়ে দিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে, হঠাৎ দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসল বাবা। 'হতভাগা দুটো মাস্টারকেই তাড়িয়েছিস, তোর মাথা আমি ভাঙব' বলে কেউ কিছু করার আগেই ধাড়ি নারকেলটার একটা বাড়ি বসিয়ে দিল মেজদার মাথায়।

'ভট্' করে একটা শব্দ হল। মেজদা 'উঃ' করে মাথা চেপে বসে পড়ল। মা আর্তনাদ করে উঠল, 'হায় হায় একি করলে কী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

বাবা নিজেও হায় হায় করে উঠল, মেজদি, ছোড়দি রুমাল বার করে নীরবে চোখ মুছতে লাগল। ছোড়দা তক্তোপোশের তলায় সেঁধোল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম বাবা আবার হায় হায় করে উঠল, 'ইস নারকোলটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল!! কী মাথা রে বাবা!!!'

মেজদার কাছে গিয়ে বোঝা গেল মেজদার জ্ঞান আছে। নিজের মনে কী সব বিড়বিড় করে চলেছে মেজদা। মুহূর্তে যে যার জায়গায় ফিরে এলাম। যাক মেজদা অজ্ঞান হয়ে যায়নি। মাথাও ফাটেনি। অত ভয়ের কিছু নেই। বাবা কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মা বাবাকে যাচ্ছেতাই যা তা বলে যেতে লাগল। আমি, ছোড়দি, মেজদি, সেজদা সকলে মেজদাকে ঘিরে বসে পড়লাম। মেজদা একমনে বিড়বিড় করে চলেছে। একটু কান করে আমরা বুঝতে পারলাম মেজদা স্বরবর্ণ আওড়াচ্ছে। তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ তারপর প্রথম ভাগ। কিছু পরে সেজদা আমার কানে কানে বলল, 'ক্...ক্...ক্...ক্...থা...মা...মা'। ঘোরালো পরিস্থিতিতে, সেজদার তোতলামোর জন্য সেজদার কথামালা চট করে বোঝা শক্ত। আমি আর সেজদা একঘরে থাকি বলে সেজদার কথামালা আমি চট করে বুঝতে পারি। সেজদা বলতে চাইছিল 'কথামালা' মানে মেজদা কথামালা আওড়াচ্ছে। কথামালা আখ্যানমঞ্জরীটঞ্জরী আওড়ানো শেষ করে, এক গ্লাস জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালো মেজদা, তারপর পড়া আওড়াতে আওড়াতে চলে গেল নিজের ঘরে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

ঝড়ের মতন পড়া আওড়ে চলল মেজদা। পেরোতে লাগলো ক্লাসের পর ক্লাস। আমরা মেজদাকে উৎসাহ খাবারদাবার আর শরবত সাপ্লাই করলাম। পালা করে রাত

জাগলাম মেজদার সঙ্গে। কিছুই বাদ দিল না মেজদা। ব্যাকরণ কৌমদি, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ, জাম্ববান, geometry, trigonometry, বাবরের হিস্টরি থেকে রাবণের জ্যোগ্রাফি পর্যন্ত, নো বাদাবাদি। তিনদিন চার রাত একটানা পড়া আওড়ে মেজদা থামল এসে ক্লাস টেনের শেষের দিকে।

সব শুনে ছোটকা, মানে মেজদার সব্বার বড়ো পৃষ্ঠপোষক লাফিয়ে উঠে বলল, 'তোরা ওকে এদ্দিন চিনতে পারিসনি। আমরা রাজনীতি করিও, চোখ অনেক পরিষ্কার। আমি ওকে ঠিকই চিনেছি। বংশের নাম রাখবে ও—ই। পড়াগুলো ওর মগজে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে ঢোকার মতন ঢুকতো ঠিকই কিন্তু বেরিয়ে আসার রাস্তা পেত না খুঁজে। দুদিন আগে নারকোলের গুঁতোয় বেরোনোর মুখগুলো সব খুলে গেছে। সব নাট বল্টু ইস্ক্রুপগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় লেগেছে।'

দিন পনের বাদেই টেস্ট পরীক্ষা। মেজদার পড়ায় মনোযোগ দেখে সক্কলের তাক লেগে গেল।

মেজদা পরীক্ষা দিয়ে এল যেন অন্য মানুষ। কী আত্মবিশ্বাস!

মেজদা ফার্স্ট, একথা স্যারেরা যেন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। অমিতবাবু আর বিজয়বাবু অন্য স্যারেদের বললেন, 'কেমন দিলাম দেখলেন!'

বয়সে বড়ো স্যারেরা বললেন, 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে।' ছোটকা বলল, 'যাক অজুর জন্য স্যারেদের আর শরীর খারাপ হবে না।'

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল মেজদা ড্যাং ড্যাং করে। 'কমাস' বাদে রেজাল্ট বেরোল। মাত্তর দু নম্বরের জন্য সেকেণ্ড হয়েছে মেজদা মাধ্যমিকে। বাবা জীবনে এই প্রথম আনন্দে তোতলা হয়ে পড়ল, বিছানায়।

ইস্কুলের শুধু না সারা পাড়ার প্রেস্টিজ। স্কুলের ছেলেরা মেজদাকে কাঁধে করে ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রসেশন করে গান বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল সেদিন।

রাতে খাবার সময় ছোটকা বলল ,'পরশু রবিবার ইস্কুলের সক্কলকে ভোজ খাইয়ে দেব। হেডস্যার থেকে দারোয়ান, সক্কলকে।'

পরদিন ইস্কুলে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো ছোটকা। ইস্কুল একদম ফাঁকা। কজন ছেলে ইস্কুলের মাঠে খেলা করছে। ছোটকাকাকে দেখে দারোয়ান শিউচরণ এগিয়ে এল। ছোটকা শুধোল, 'ইস্কুল কি আজও ছুটি নাকি?'

শিউচরণ একগাল হেসে বলল, 'ক্লাস কে নেবে স্যার। অজয়বাবুর রেজাল্টের এক ধাক্কায় স্যারেরা এখোনো বিছানায়। পিলে তো পিলে সক্কলের মাথার ঘিলু অবধি চলকে গেছে।

সিন্দুকের চাবি

রবিবার সাত সকালে ভুলোমামা আমায় বলল, 'আজ জগাছায় একটা আম-কাঠের সিন্দুক দেখতে যাব। আমার জন্যে নয়, বড়দার জন্যে। আমায় বারবারই চিঠিতে লেখে এবার একটা মজবুত আমকাঠের সিন্দুক এনো আমেরিকা থেকে। বড়দার ধারণা যে দেশের নাম 'আম' দিয়ে শুরু সেখানে নির্ঘাৎ ভালো আমকাঠের সিন্দুক মেলে। জগাছায় আমকাঠের সিন্দুকের খবরটা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পেয়েছি। তুই কিন্তু আমার সঙ্গে যাবি।'

ভুলোমামার আসল নাম কিন্তু ডক্টর্ গঙ্গাধর ঘোষাল। অতিরিক্ত ভুলের থেকেই 'ভুলো' নামটার জন্ম। পড়াশোনা আর কাজের ব্যাপারে কিন্তু ভুলোমামার কোনও ভুলটি হয় না। হলে কি আর অত ডিগ্রী টিগ্রী করতে পারত।

ভুলোমামা থাকে আমেরিকায়। প্রত্যেক বছর মাস দেড়েকের জন্য কলকাতায় আসে। স'ঙ্গে আনে এক উদ্ভট পরিকল্পনা। আমার ইচ্ছে না থাকলেও ভুলোমামার

তালে তাল দিতেই হয়, কারণ ফি-বছর ভুলোমামা আমাকে এনে দেয় নতুন নতুন সুন্দর উপহার। ভুলোমামা দিন দশেক কাটায় আমাদের বাড়িতে, কলকাতায়। তারপর চলে যায় অজ পাড়াগাঁয়ে আমার মামাবাড়িতে। ছুটির শেষে ফের আমেরিকা।

জগাছা স্টেশন থেকে সিন্দুকের মালিক ক্ষেত্রমোহন পালের বাড়ি মাইল দেড়েক দুর। ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি যে ক্ষেতের ভেতর হবে সেটা আমি আগেই ভেবেছিলাম, খুঁজতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

আমকাঠের সিন্দুকটা সত্যিই দেখার মতন। ইয়াব্বড়। ভুলোমামার মতন পাঁচটা লোক অনায়াসে হাঁটু গেড়ে ভেতরে সেঁধিয়ে যাবে। আমি ফিস্‌ফিস্ করে শুধোলাম, 'এই এতো বড়ো সিন্দুক নিয়ে যাবে কী করে?'

ভুলোমামা বলল, 'আরে, লোকে হাতি চালান করছে। পুকুর চুরি করে কী জন্যে? নিশ্চয় চালান দেয়। আর এই সিন্দুকটা চালান করা যাবে না? তুই ছেলেমানুষি থামাবি?'

ক্ষেত্রমোহনবাবু সিন্দুকের গুণগান আরম্ভ করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর স্ত্রী, দুই ছেলে আর মেয়ে ভুলে যাওয়া পয়েন্টগুলো ধরিয়ে দিতে থাকল। 'সিন্দুকটা, আমার ঠাকুর্দার আমলের। ডালাটা এতো ভারি যে দুটো লোকে শাবল দিয়ে ছাড়া খুলতে পারে না। কোণাগুলো দেখছেন তো পেতল দিয়ে বাঁধানো, করাত দিয়ে কাটা সম্ভব না। আর এই চাবিটা দেখছেন?'

আমরা চাবিটা দেখলাম। বেশ বড়ো সাইজের। প্রায় এক বিঘৎটাক হবে। হাতলের দিকটায় নক্সাকাটা, দেখার মতনই বটে।

'খাস বিলিতি তালা, মশাই খাস বিলিতি। এমনটা এখন মাথা খুঁড়লেও পাবেন না।'

বিন্তি ক্ষেত্রবাবুকে মনে করিয়ে দিল, 'বলো না বাবা সেই গল্পটা।'

আড়চোখে দেখলাম, ভুলোমামা গল্প শোনার জন্য উদগ্রীব। ততক্ষণে দু প্লেট মিষ্টি এসে গেছে। ভুলোমামা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আবার মিষ্টি কেন?'

আমিও হাঁ হাঁ করলাম। দুবার হাঁ-এ দুটো রসগোল্লা মুখের ভেতর টপাৎ। বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল।

ক্ষেত্রমোহনবাবু শুরু করলেন, 'বাপ ঠাকুর্দার আমলে আমাদের একান্নবর্তী পরিবারটা ছিল বেশ বর্ধিষ্ণু। প্রচুর জায়গাজিরেত, প্রচুর আমবাগান, জামবাগান। অনেক ঘর হিন্দু-মুসলমান চাষী আমাদের ক্ষেতে লাঙল চালাতো। সবথেকে বড়ো কথা, আমাদের সাথে গ্রামের সক্কলের ভারি সদ্ভাব ছিল। সব চাষীরা আমাদের পরিবারকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতো আর তারও বেশী ভালবাসতো। তার মূল কারণ আমরা ওদের ওপর কখনোই জোরজুলুম করতাম না। আমাদের যা ধান-চাল, শাক-সবজী জুটতো তা দিয়ে আমাদের মতন পাঁচটা পরিবারের অনায়াসে চলে যেত। ঠাকুর্দা ছিলেন গ্রামের মোড়ল গোছের।

বৈশাখ মাসের এক চাঁদনী রাত। বড়রা যখন দাওয়ায় আর বাগানে আড্ডা দিচ্ছে, গিন্নিরা রান্নাঘরে, ছোটরা লুডো খেলছে আর বাচ্চারা মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে

ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ 'হা রে রে রে রে', একটা বিশাল শব্দে চাঁদনী রাত ফালা ফালা হয়ে গেল।

মুহূর্তে কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে, ডাকাত পড়েছে। কারো হাতে হ্যাচাকের আলো, কারো হাতে ছোরা, বাকিদের হাতে বল্লম টল্লম। অন্তত তিরিশটা লোক। বাড়িতে একটা বন্দুক ছিল। বড় জ্যাঠামশাই বন্দুক বের করে ছাদে দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেন। ডাকাতগুলো একটু থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে বাড়ির মেয়েরা আর বাচ্চারা ঘরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে দিয়েছে। বাবা কাকার দল জ্যাঠামশাইএর সাথে ছাদে। সবাই ভেবেছিল যে ডাকাতগুলো ভয় পেয়েছে। কিন্তু হঠাৎ পেছন দিক থেকে কতগুলো ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়ো জ্যাঠার ঘাড়ে। সকলে যখন বাড়ির সামনের দিক আগলাতে ব্যস্ত তখন ওরা ফন্দিমাফিক গাছপালা আব পাইপ বেয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছাদে চড়াও হয়েছে।

বড় জ্যাঠাকে বন্দুকসুদ্ধু চেপে ধরতেই সবাই সত্যি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ডাকাতগুলো ভোজালি দেখিয়ে বলল, 'বেকার গুলি ছুঁড়ে বোকার মতন রক্তারক্তি করবেন না। আমরা খোঁজ নিয়েই এসেছি। সিন্দুকের ভেতর অনেক সোনা। চাবিটা ভালোয় ভালোয় দিন, নাহলে প্রচুর খুনখারাপি হবে।'

বড়রা, যাদের হাতে গুলি গোলা ছিল, তারা একটু তেজ দেখানোর চেষ্টা করলে, না হলে প্রেস্টিজ থাকে না। কিন্তু বড় জ্যাঠা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কারো গায়ে হাত পড়বে না তো চাবি দিলে?'

ডাকাতগুলো বলল, 'কারোর টিকিতেও না।'

'চল, নীচে চল, দিচ্ছি।'

'ওটি হবে না। আপনি এখানে থাকুন আমাদের সাথে, ওই হ্যাঙলাপানা প্যাঙলাটাকে পাঠিয়ে দিন। চাবিটা নিয়ে আসুক,' বলে আমার দিকে আঙুল দেখাল।

পর পর দু দুখানা অপমান, হজম করা শক্ত। আমার কান টান লাল হয়ে উঠল, শিরাগুলো দপদপালো, পা নিশপিশ করতে লাগল। হাতে ভোজালি না থাকলে বেটাকে এমন একটা ল্যাং ঝাড়তাম যে, ওটার কপালে দুটো আলু হয়ে যেত।

নীচে নেমে দেখি ডাকাতে ডাকাতে বাড়ি গিজগিজ করছে। কাছ থেকে দেখলাম কারো কানে মাকড়ি আর কারো গায়ে বোঁটকা গন্ধ।

হোঁৎকা ডাকাতটার অপমানে আমার গা তখনও চচ্চড় করছিল। বড়মার কাছ থেকে চাবি নেবার ফাঁকে আমি সট করে বেশ খানিকটা বার সাবান গুঁজে দিলাম সিন্ধুকটার চাবির ফুটোয়।

সাবান আর তেল পরস্পরের ঘোর শত্রু। তেল দিলে তালা চট করে খুলে যায় তাই সাবান ঢোকালে খুলতে নির্ঘাত বেগ পেতে হবে। হলও তাই। ডাকাতেরা সিন্দুকে চাবি ঢুকিয়ে, ঘোরাতেই পারে না। তখন ওরা একই সঙ্গে চেষ্টা লাগাল সিন্দুকটা ভাঙার। দম দমাদম পেটাতে আর খোঁচাতে শুরু করল শাবল টাবল, আর কতো কিছু দিয়ে। কিন্তু কোথায় কী? সিন্দুক একটু টসকাল না পর্যন্ত।

ডাকাত সর্দারটার বুদ্ধি ছিল। প্রায় তিরিশ মিনিট এমন চলার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কোনও বাচ্চা টাচ্চা এর ভেতর কিছু গুঁজে দিয়েছে। তখন সকলে মিলে একবার করে জলের ঝাপটা দেয় ফুটোটাতে তারপর ঘোরায় চাবি। মিনিট পনেরোর মাথায় চাবি ঘুরিয়ে শাবলের চাড় মেরে সিন্দুকটা খুলে ফেলল ডাকাতেরা। সিন্দুকের ভেতরটা আমি আগে দেখিনি। সোনার গয়নায় ঠাসা। ডাকাতগুলো খবর ঠিকই পেয়েছিল।

ডাকাতের সর্দার সবে একটা বিড়ি ধরিয়ে সোনার গয়না বার করার জন্য বেশ ক'টা লোক নামিয়েছে সিন্দুকে, হঠাৎ উঠল আরেকটা সাংঘাতিক 'রে রে রে রে' শব্দ, আগেরটার চেয়ে দশগুণ জোরাল। সকলে ভাবল এবার ডাকাতে ডাকাতে লড়াই হবে। এক বাড়িতে একই দিনে দুদল ডাকাত? ঘটনাটা অভূতপূর্ব।

'রে রে রে রে' আওয়াজটা শুনে ডাকাতদের দলপতি একটু নার্ভাসই হয়ে পড়ল। মুখ থেকে বিড়ি পড়ল খসে আর গয়নাগাঁটি ছেড়ে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারতে মারতে বলল, 'নৃসিংহের দল আসছে বোধ হয়। চটপট কেটে পড়াই ভালো।'

আমি কিন্তু ঠিকই ভেবেছিলাম। নৃসিংহের দল না কচু! আমাদের চাষী আর গ্রামাবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের বাঁচাতে।

প্রায় দুশো লোক এসে গেছে। লোক বললে ভুল হয়, অন্তত তিরিশজন মহিলা। যদ্দুর মনে পড়ে একশোজনের হাতে ধারালো কাস্তে, পঞ্চাশজনের কাঁধে কুড়ুল, পঁচিশজনের হাতে ধারালো বঁটি (বুঝতেই পারছ কাদের হাতে) আর বাকিদের হাতে

বিভিন্ন অস্ত্র—ভাঙা বোতল, হকি স্টিক, জামবাটি, লাঠি, মুড়ো ঝাঁটা, এমনকি একজনের কোলে একটা পাগলা কুকুর আর একজনের কাঁধে শিল। মদন আমার বন্ধু, মনে হয় হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, এনেছে একটা লিকলিকে বেত। আমি বললাম, 'বেত দিয়ে ডাকাতদের কি করবি?'

সকলে বাড়িটা ঘিরে ফেলল এক নিমেষে। তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। সে এক সাংঘাতিক সিন।

মেয়েরা বলে, 'বঁটিতে কাটব।'

ছেলেরা বলে, 'কাস্তেয়।'

হুলুস্থুলুস ব্যাপার। কেউ কাউকে ছাড়বে না। যারা কোদাল এনেছে তারা কুপোতে চায়, জামবাটিওলারা ডাকাতের মুণ্ডু জামবাটিতে পুরতে চায়। পাগলা কুকুরটা ততক্ষণে পাঁচটা ডাকাতকে কামড়েছে।

ঠাকুর্দা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুধোলেন, 'তোরা যে নিজের থেক্যে এলি বটেক?'

গ্রামবাসী, চাষী আর চাষী-বৌরা বলল, 'গগন মোড়ল, তুমি চিরকাল মোদের নিজের ছ্যেলের মতন দ্যেখছ, তোমার বিপদে না এলে অধর্ম হবেনি? পরাণটা কি ইজ্জতের চেয়ে দামী?'

ঠাকুর্দা কিছু বললেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম আনন্দে ঠাকুর্দার চোখে জল। ততক্ষণে ডাকাতগুলো ভয়ে সেঁধিয়েছে ওই সিন্দুকের ঘরে। অবস্থা জিয়নো কই মাছের মতন। পালাতে গেলে গর্দানটা কাস্তে বা বঁটিতে রেখে যেতে হবে। যদিবা নিয়ে যেতে পারে তো নিতে হবে চিঁড়ে চ্যাপটা। শিলে বাটা।

ঠাকুর্দা বললেন, 'নিয়ে আয় বেত। তোরা কাউকে মারিস না।'

মদন বেতটা এগিয়ে দিল।

ডাকাতরা দশ ঘা বেত খেয়ে আর ক্ষমা চেয়ে বিদ্যুতগতিতে উধাও হল। যেমন এসেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে পালাল। ছাড়ার আগে আমরা ওদের সার্চ করে আমাদের সোনার যা যা পেলাম সেগুলো রেখে দিলাম।

গ্রামের সকলে খুব শান্তিতে ফিরে গেল।

গল্পটা শেষ হতে ভুলোমামা বললে, 'দেখি একবার সিন্দুকের ভেতরটা।'

ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, 'চাবিটা দাও তো।'

গিন্নি বললেন, 'চাবিটা তোমার কাছে, একটু আগেই দেখালে না?'

চাবিটা ক্ষেত্রমোহনবাবু এ পকেট সে পকেট হাতড়ে খুঁজে পেলেন না। আমি, ভুলোমামা-শিবাই, গদাই, বিন্তি, ক্ষেত্রবাবু সস্ত্রীক লেগে গেলাম চাবিটা খুঁজে বার করতে।

সম্ভাব্য সব জায়গাগুলো খুঁজে ফেলা হল। আলমারীর মাথা, বইয়ের শেল্‌ফ, তোশকের তলা এমনকি বালিশের ওয়াড়, ওরা বাড়ির অন্যান্য জায়গাগুলোও খুঁজে এল।

হঠাৎ দেখি ভুলোমামাও গায়েব। সারা বাড়ি খোঁজা হল কিন্তু ভুলোমামার টিকিটি নেই। আমি ভয় পেয়ে গেলাম—চাবি গায়েব, তারপরই ভুলোমামা গায়েব চোখের ওপর, হয়তো একটু পরে আমি নিজেই গায়েব হব নিজের চোখের সামনে!—

এমন সময় বিন্তি বলল, 'তক্তাপোশের তলায় দুটো পা দেখা যাচ্ছে না!' আমি সাহসে ভর করে এগিয়ে দেখি—ভুলোমামার পা। নীচু হয়ে তক্তাপোশের নীচে যা দেখলাম তাতে তো চক্ষুস্থির। ভুলোমামা একমনে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে, খাটের তলায় শুয়ে।

ভুলোমামাকে বার করতেই বললে, 'সব গুলিয়ে দিলি। এই বইটা আমি বহুদিন ধরেই খুঁজছিলাম।'

চাবিটা কিন্তু পাওয়া গেল না।

গদাই বলল, 'চৌমাথায় যে চাবিওলাটা বসে থাকে ওকে ডাকব বাবা?'

ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'লাভ হবে না। এ সিন্দুকের তালা ওই চাবিওলার বাবাও খুলতে পারবে না।'

গদাই বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। তাই তো ওর বাবাকে ডাকার কথা মোট্টে তুলিনি, লোকটা বোগাস।'

ক্ষেত্রবাবু ভুলোমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার আজকে আসার চিঠি পেয়েই আমি সিন্দুক ফাঁকা করিয়ে রেখেছি। আপনি বরং ওটা নিয়ে যান, কলকাতায় ভালো চাবিওলা ডেকে খুলে নেবেন। জগাছার চাবিগুলাতে....'

ভুলোমামা ভুরু কোঁচকালে, 'না মশাই, ওইটি পারব না। ওর ভেতর সাপ, ব্যাঙ, হাতি, ঘোড়া কী আছে, না দেখে নিয়ে যেতে পারব না। তারপর পুলিশে ধরুক আর কী।' আমিও ভুলোমামার সঙ্গে যোগ দিলাম, 'বোমা কিম্বা গলিত লাশ টাশ যদি থাকে? কে সামলাবে তখন?'

অগত্যা আমি আর গদাই ছুটলাম চাবিওলার খোঁজে।

চাবিওলার নাম বীরু, ক্ষেত্রবাবু নেহাত তাচ্ছিল্য আর অনিচ্ছা মিশিয়ে বীরুকে বললেন, 'ও সিন্দুক কি আর খুলতে পারবে? চেষ্টা করে দেখ।'

বীরুর খুব একটা ভাবান্তর দেখা গেল না। ডিবে থেকে এক খিলি পান মুখে ফেলে সিন্দুকের চাবির ঘরটাতে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে উবু হয়ে বসে যন্ত্র বার করতে করতে বলল, 'চার টাকা লাগবে কিন্তু।'

ক্ষেত্রবাবু মৃদু হাসলেন, 'আগে খোলো তো তুমি।'

বীরু ঝোলা থেকে একটা চায়ের চামচের সাইজের লোহার টুকরো বার করে, ফাইল দিয়ে ঘষতে শুরু করল। মিনিটখানেক লোহাটার এদিক সেদিক ঘষে, বীরু ওটাকে চাবির গর্তে ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিল। কড়াক করে একটা আওয়াজ। বীরু লোহার টুকরোটা ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিয়ে বেশ বিনয়ী কণ্ঠে বলল, 'এই নিন বাবু চাবি।'

ব্যাপার দেখে আমাদের সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ। ক্ষেত্রবাবুর মুখ দিয়ে একটা হতাশার হাহাকার বেরিয়ে পড়ল, 'খুলে গেল!'

বীরু পান চিবোতে চিবোতে বলল, 'এগুলো পুরোনো লক্কড় মার্কা ফক্কড় গোছের বিলাতী তালা। বেকার আমাকে ডেকে টাকা নষ্ট করলেন। একটা সরু শিক, একটু বেঁকিয়ে নিয়ে, চাবির গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরালেই খুলে যেত। অবশ্য এটা মেয়েদের উল বোনার কাঁটা দিয়েও হত কিম্বা একটা পুরোনো চামচ টামচ একটু....'

ক্ষেত্রবাবু আর সামলাতে পারলেন না, খেঁকিয়ে উঠলেন, 'থামো, থামো! আর জ্ঞান দিতে হবে না'।

বীরু খুব নম্র গলায় বলল, 'বাবু চারটে টাকা।'

ভুলোমামা এতোক্ষণ কোনো কথা বলেনি। অন্যমনস্ক হয়ে নিশ্চয়ই ফরমূলা ভাবছিল। টাকার কথা শুনেই বলল, 'ক্ষেত্রবাবু টাকাটা বরং আমিই দিয়ে দিই।'

ক্ষেত্রবাবু কিছু বললেন না। ভুরু কুঁচকে অভিমানভরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভুলোমামা টাকা বার করতে পকেটে হাত দিয়েই লাফিয়ে উঠল।

'কি সাংঘাতিক!! সিন্দুকের চাবিটা আমার পকেটে সেঁধলো কী করে? ছিঃ ছিঃ' বলেই একটা বিশাল জিভ কেটে ক্ষেত্রবাবুকে হরেক রকমের সরি, একস্‌কিউজ মি, সিনসিয়ারলি, প্লিজ টিজের বন্যায় ভাসিয়ে দিল। ক্ষেত্রবাবু অভিমানভরে বাইরেই তাকিয়ে রইলেন।

বীরু একটু হাত কচলে বলল, 'আজ্ঞে টাকাটা।'

বীরুর হাতে চারটে টাকা দিয়ে ভুলোমামা বলল, 'চল চল, আর দেরী নয়। ছ'টা দশের ট্রেনটা মিস্‌ হয়ে যাবে।'

আমার কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছিল। রিক্সায় যেতে যেতে ভুলোমামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী রকম হল?'

ভুলোমামা অন্যমনস্কভাবে বললো 'বীরুটাই তো যতো নষ্টের গোড়া।'

চিঠি

চিঠির বাকি অংশ বা একশো টাকার নোটটা কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না। খোঁজাখুঁজিতে হস্টেলের ঘরটা রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করল। একটা বালিশ ফেটে সকলের মুখে তুলো লেগে বয়স ষাট বছর বাড়িয়ে দিল। কুঁজোটা উল্টে ঘরের মেঝেতে জল থৈ থৈ করতে লাগল। দুটো ধেড়ে ইঁদুর, বারোটা টিকটিকি, তিনটে বিছে আর অজস্র আরশোলা মারা পড়ল। বেশ ক'বছর ধরে হারানো, খুব দামি অনেকগুলো জিনিস বেরিয়ে পড়ল। নয়নের মন্ত্রপূত মাদুলীটা যা পরলে পাশ অনিবার্য, সেই শুকনো কলার খোসাটা, যাতে হস্টেলের সুপার ডিগবাজী খেয়েছিলেন (হরি সেটা সযতনে রেখে দিয়েছিল), আমার সংগৃহীত মামদো ভূতের একটা কষের দাঁত ইত্যাদি। কিন্তু চিঠির বাকি অর্ধেক আর একশো টাকার নোটটা পাওয়া গেল না।

আমরা চারজন হস্টেলের একটা ঘরে থাকি। বৃন্দাবন, নয়ন, হরি আর আমি। বৃন্দাবন বলল, 'যা হাওয়া দিচ্ছে কদিন। ওগুলো নিশ্চয়ই একটা দমকা হাওয়ায় উড়ে

গিয়ে পড়েছে নীচে, উঠোনে, তারপর ঢুকে গেছে সুপারের বা অন্য কারও খাটের তলায়। পাশের ঘরের গদাই এমনটাই দেখেছে বলছিল।

আমরা কথাটায় পুরো সায় না দিলেও উড়িয়ে দিতে পারলাম না।। নয়ন তার হস্তগত অর্ধেক চিঠির প্রয়োজনীয় লাইনগুলো, চা আর চানাচুরের দাগের ভেতর থেকে যথাসম্ভব উদ্ধার করে আরেকবার পড়ল। নয়নটা অনেক লম্বা—আমরা নয়নের পেছনে তক্তাপোশের ওপর থেকে একরকম হুমড়ে পড়লাম ওর ঘাড়ে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ কাটানোর জন্য।

চিঠিটা নয়নের বাবার লেখা। 'আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে তুমি এই চিঠির খামে একটা একশো টাকার নোট পেয়ে কী করবে?'

বৃন্দাবন বলল, 'ওটা পেয়ে লিখেছে না পেলে লিখেছে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু।'

আমরা বৃন্দাবনকে ধমকে থামিয়ে দিলাম, 'তোর সব তাতে পাকামি। একই তো কথা। তা ছাড়া, চিঠিটার ওপর চা ফেলে ঝাপসা তুইই করেছিস। এতো খুঁতখুঁতুনি যখন, তখন চা-টা না ফেললেই পারতিস। তুই-ই চিঠির বাকিটা আর নোটটা নির্ঘাৎ মুড়িয়ে ফেলে দিয়েছিস।'

নয়ন পড়ে চলল, 'তোমার একশো টাকা খরচ করা সম্বন্ধে আমাদের সকলের মতই ভিন্ন। আমি, তোমার মা এবং তোমার ছোট বোন খুন্তি যা ভাবছি তাতে কারো সাথে কারো বিন্দুমাত্র মিল নেই। তাই মনে হল তোমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করাই......' থেমে গেল নয়ন, দোষ নেই। পরের খানিকটা কুয়াশার মতন ঝাপসা। কিছু দূরে গিয়ে আবার পড়া যাচ্ছে, 'তুমি ভালো থেকো, পড়ায় মন দিও, প্রাতে ছোলা খেয়ো ইত্যাদি বাড়ি থেকে আসা সব চিঠির গ. সা. গু.-গুলো।

বৃন্দাবনের টাকা উড়ে যাওয়ার কথাটায় মনে হল যুক্তি আছে। হরি আর নয়ন বল খোঁজার ভান করে, নীচের সব ঘরগুলো খুঁজে এল। এমনকি সুপারের ঘরও। ঘরে ঢুকে দেদার খোঁজাখুঁজিতে হয়তো অনেকেই আপত্তি তুলতো। কিন্তু নয়নটা বক্সিং চ্যাম্পিয়ান। তাই কেউ তেমন আপত্তি করেনি। সুপারের স্ত্রী, সুপার মাসিমা অবশ্য খুব ভালো মানুষ। সুপারের ঠিক উলটো। উনি তরকারির ঝুড়ি পর্যন্ত খুঁজতে দিলেন। চিঠি আর টাকা কিন্তু তাও পাওয়া গেল না।

হস্টেলে চিঠিগুলো পৌঁছোয় ঠিকই। প্রত্যেকটা ঘরে চারটে করে ছেলে। সকলের চিঠি। সব ঘরে একই নিয়ম। চিঠিগুলো এককোণে ডাঁই করা থাকে। বাড়ির লোকের ধারণা আমরা হস্টেলে খারাপ থাকি। তাই মা, বাবা তো লেখেই, মাসি, পিসি, দাদা, দিদি, সকলেই লেখে। ওরা তো জানে না আমরা কি মজায় থাকি। চিঠি লেখে বিষণ্ণতার বিষ কাটাতে। চিঠিগুলো তেমন অবসর ছাড়া পড়া হয় না। আমাদের

খারাপই লাগে। আশা প্রত্যাশার বিনিময়ের জন্যই চিঠির জন্ম। আমরা জানি কতো কষ্টে ঝাড়া একপাতারও বেশী বাংলা লেখা উৎপন্ন হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের উত্তর দেওয়া হয় না।

সবার বাড়ির চিঠিগুলো একই ছকে বাঁধা। একই গৎ। নামগুলো না থাকলে বোঝাই যেতো না কোনটা কার। প্রথমে একটা স্নেহসিক্ত শুরু। তারপর ভালো আছি কি না সেই প্রশ্ন। তারপর পড়াশোনা আর স্বভাব ভালো করার উপদেশ। তারপর

কিছু অভিমান ভরা অনুরোধ, প্রত্যুত্তরের জন্য। শেষে স্নেহাশিস্ ঢালা সমাপ্তি।

আমরা অনেকে একদিন গবেষণা করছিলাম 'সব্বার বাড়ির চিঠি একরকম কেন' তাই নিয়ে। বৃন্দাবন বলেছিল, 'আরে, বাবা মায়েরা সকলেই তো একই বই পড়েছে। ব্যাকরণ কৌমুদি, কিশলয় আর নেসফিল্ড গ্রামার। চিঠিগুলো তো একরকম হবেই।'

একমাত্র হরির বাবার লেখা চিঠিগুলো একটু অন্যরকম। প্রত্যেক চিঠিতেই লেখেন, 'তোমাদের ইস্কুলের কর্ণধারকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। তাই নিয়ে এক কেলেঙ্কারি করেছিল হরি। চিঠিটা নিয়ে বাংলার স্যার বদ্যিনাথবাবুকে বলেছিল, 'পড়ুন স্যার, আমার বাবা আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

হরির দোষ নেই। বদ্যিনাথবাবুই সবচেয়ে বেশী ধরেন আমাদের কর্ণ। চিঠি পড়ে হরির কানটা সাপটে ধরে বলেছিলেন বদ্যিনাথবাবু, 'হতভাগা, ইস্কুলের কর্ণধার মানে কাণ্ডারী, অর্থাৎ হেডস্যার। এটাও জানিস না?' প্রতিবাদ করেনি হরি।

বাড়ির চিঠিগুলো কিন্তু মোটেই ফালতু নয়। খুব কাজে লাগে। সন্ধেবেলায় চা আর চানাচুরের আড্ডায় দারুণ দরকারী। ঠোঙা বানানোর অমন জিনিসটি হয় না। খাম থাকলে তো কথাই নেই।

নয়নের চিঠির খামটা তখনও কিছু চানাচুর বুকে আগলে তক্তপোশে পড়ে ছিল। হরি সেটাকে পাশবালিশের খোলের মতন আরেকবার উল্টালো। কোথায় কী! একটা পুত্রশোকের হাহাকার ভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল নয়নের বুক থেকে। 'দারুণ একটা ব্যাট কেনা যেত...এই শীতটা......'

আমরা বৃন্দাবনের দিকে কটমট করে তাকালাম, 'তুইই যতো নষ্টের গোড়া। চিঠিটাকে ছিঁড়ে তাতে চানাচুর লেপ্টেছিস। তারপর চা ঢেলে সব ভাসিয়ে দিয়েছিস।'

বৃন্দাবন বলল, 'অতো দরকারি বুঝব কী করে? সব চিঠির হালই তো ওই হয়। নয়ন আগে পড়েনি কেন?'

ভেঙচে উঠল নয়ন, 'তুই তোর বাড়ির চিঠি কতো পড়িস। পড়লে তো বাংলা শিখেই যেতিস। একশোয় দশ পেতিস না।'

আমি নয়নকে বললাম, 'দেখ, টাকাটা হয়তো তোর বাবা পাঠাতে ভুলে গেছেন বা পাঠাননি। তোর কাছে টাকা খরচের রীতি জেনে তারপর পাঠাবেন।'

নয়ন বলল, 'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না কারণ বাড়ির চিঠি খামে তো সাধারণত আসে না । বাকি চিঠিটা পেলে বড়ো ভালো হত।'

সকলে মিলে সাব্যস্ত করা হল যে নয়নের এক্ষুণি বাড়িতে চিঠি লেখা উচিত। জানানো উচিত যে টাকাটা পাওয়া যায়নি, আর সঙ্গে নয়ন কীভাবে একশো টাকা খরচ করবে তার একটা সুন্দর ফিরিস্তি। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়,তো ওটা পড়েই টাকা পাঠাবেন নয়নের বাবা।

বৃন্দাবন বলল, 'তোর তো একটা ভালো ক্রিকেট ব্যাটের শখ বহুদিনের। সেটা লিখে জানিয়ে দে।'

নয়ন বলল, 'পাঁঠার মতন বকিস না।। বাবা ভাববে সারাদিন খেলবো আর পড়াশোনা গোল্লায় যাবে। তাতে টেনশন্ বাড়বে। টাকা পাঠাবে না।'

হরি বলল, 'পরোপকার'টা বাবা মায়েদের খুব প্রিয় সাবজেক্ট। লিখে দে অনেক অন্ধদের রাস্তা পার করিয়া দিব, প্রচুর খঞ্জকে খঞ্জনী বাজানো শিক্ষা দিয়া দারিদ্র্যের গঞ্জনার হাত থেকে মুক্ত করিব। ভাষার দিকটাও তো দেখাতে হবে চিঠিতে।'

আমি বললাম, "পরোপকারের লাইনটা ঠিকই আছে কিন্তু এগুলোতে তো টাকা খরচ নেই। এর বিনিময়ে টাকা চাওয়াই তো পাপ। তাহলে দেবেন না।

নয়নই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, 'দারুণ পরোপকার পেয়ে গেছি। দীনদরিদ্র ভোজন। আমাদের বাড়িতে নিজেরা খাই না খাই পালে পাব্বনে দীন দরিদ্র ভোজন হয়। যদি লিখি বহু দীনকে নিমন্ত্রণ করে কলাপাতায় খাওয়াব?'

হরির খঞ্জদের খঞ্জনী শিক্ষণ বাধা পাওয়ার মান তখনও ভঞ্জন হয়নি, সে খেঁকিয়ে উঠল, 'কলাপাতা খাওয়াতে বুঝি এই পাড়াগাঁয়ে খরচ হয়।'

আমি শুধরে দিলাম, 'আঃ, ওটা কলাপাতা নয়, কলাপাতায়।' আরো অনেক তর্কাতর্কি হল, অবশেষে চিঠিটা দাঁড়াল এই রকম ঃ

শ্রীচরণেষু বাবা,

আশা করি তোমরা সকলে কুশলেই আছ। ......আমি ভালো আছি।......খুব পড়াশোনা করছি। এবার পাশ অনিবার্য। মা নিশ্চয়.......খুন্তির ইস্কুল.........

বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম তোমার গত চিঠির খামে একশোটি টাকা কিন্তু আমি পাইনি। হয়তো শেষ মুহূর্তে কর্মব্যস্ততা হেতু খামে পুরতে ভুলে গেছ। এখানে চারপাশের লোকজন বড়ো দরিদ্র। ইচ্ছে আছে সামনের পয়লা বৈশাখ শুভ নববর্ষে, দীনদরিদ্র ভোজন করাব। টাকাটা পেলে সেই কাজেই লাগাতাম। অবশ্য এখনও একমাস বাকি। তাই........

তুমি ও মা আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিও। খুন্তিকে ভালবাসা জানিও। তোমার চিঠির অধীর অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—
নয়ন

চিঠিটা আমরা একেবারে পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট করে এলাম।

চার পাঁচ দিন পর থেকে আমরা এক অদ্ভুত আশার কবলে পড়লাম। হস্টেলের পিয়ন চিঠি দেয় দিনে একবার। বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আমরা রোজই হস্টেলের উঠোনে পিয়নের ব্যাগ উজাড় করে সব চিঠির ঠিকানা দেখতে শুরু করলাম। দিন যাওয়ার সঙ্গে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। একদিন তো নয়ন পিয়নের পকেটে হাত পুরে দিল দু এক পিস চিঠি ওখানে থাকতেও পারে ভেবে। পকেট থেকে টেনে যা বার করল সেটা মোটেই কোনো চিঠি নয় —সেটা একটা বাক্সের মতন পানের ডিবে।

তাই নিয়ে হুলুস্থুলুস্ কাণ্ড। পিয়ন হেডস্যারকে রিপোর্ট করবেই আমাদের নামে। অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করা গেল। হস্টেলময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে নয়নের নামে একটা গুপ্তধন বোঝাই চিঠি আসবে। তাই নিয়ে দু'চারটে গল্পও চালু হল।

দিন দশেকের মাথায় যখন উত্তেজনাটা একরকম থিতিয়ে এসেছে, আমি একদিন একটু দেরী করে হস্টেলে ফিরেছি, এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। ঢুকতেই নীচের তলার গোবিন্দ আমাকে বলল, 'তোদের নয়নের সেই গুপ্তধনের চিঠিটা আজ এসেছে রে। সব্বাই রসগোল্লা খেয়েছে!'

আমার রাগ ধরে গেল, 'কিঃ, আমার জন্য একটু দাঁড়াল না?' অবশ্য আমি জানতাম রসগোল্লা আমার জন্য আছেই আছে।

এক ছুটে ঘরে ঢুকলাম, 'নয়ন আমার রসগোল্লা কই?'

এক লহমায় যা নজরে পড়ল তাতে একটু দমে গেলাম। নয়ন চিত হয়ে শুয়ে, হরি পড়তে বসেছে, বৃন্দাবন একমনে হাই তুলে চলেছে।

'এই নে রসগোল্লা' বলে নয়ন আমার দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

আমি চিঠিটা খুললাম। নয়নের বাবার চিঠি।

স্নেহের নয়ন,

বিগত আড়াই মাস ধরে তোমাকে লেখা পাঁচটি চিঠির কোনও জবাব না পাওয়ায় আমরা তোমার বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলাম। এই চিঠিটির জবাব না পেলে আমি নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা করে তোমার ইস্কুলে যেতাম। তুমি ভালো আছো জেনে আশ্বস্ত হলাম।

তোমার চিঠির উত্তর আমার চিঠির মোটে ছদিনের মাথায় এসেছে। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় আমরা ভীষণ বিস্মিত।

একশো টাকা খরচ সম্বন্ধে তোমার উদার মনোভাবে আমরা সকলেই প্রীত। নববর্ষে তোমার মনোবাঞ্ছানুরূপ তোমার মা দরিদ্র ভোজনের আয়োজন করেছেন। এতে অবশ্য আরও অনেক বেশী খরচ হবে। তা হোক।

খুন্তির ইস্কুলের দিদিমণি ওকে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন 'একশো টাকা পেলে কীভাবে খরচ করবে'। আমাদের মতামত আমরা দিয়েছি। খুন্তির অনুরোধমতন তোমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জানি না মনের মাঝে সত্ত্বর চিঠির আশা লুকিয়ে ছিল কিনা। দরিদ্রভোজনের দিন তুমি উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। মাঝে মধ্যে এমন তাড়াতাড়ি চিঠি দিও।

স্নেহাশীষ জানিয়ে শেষ করলাম।

ইতি—
বাবা।

নয়ন জিজ্ঞেস করল, 'রসগোল্লাটা কেমন লাগল?'

আমি ধপ্ করে তক্তাপোশে বসে পড়ে বললাম, 'অঙ্কের রসগোল্লার মতন। গলা দিয়ে নামছে না। এক গেলাস জল খেতে হবে।'

এক সেরা ভূতের গল্প

রাত তখন ক'টা হবে ঠিক জানি না। শরীর খারাপ বলে ঘুমটা তেমন গাঢ় ছিল না। হঠাৎই ভেঙে গেল। যা ঘটল তা শুনলে তোমাদের গায়ে কাঁটা দেবে। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম একটা ভূত আমার পাশে বসে পা দোলাচ্ছে। সারা ঘরে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। স্কুল হস্টেলের এই ঘরের অন্য অংশীদারেরা একমনে নাক ডাকিয়ে চলেছে ওরই ভেতর আমি টের পেলাম আমরা প্রায় ঘাড়ের ওপর বসে একটা ভূত ঠ্যাং দোলাচ্ছে। ভয় পাওয়া হয়তো উচিত ছিল কিন্তু আমি ভয় পেলাম না, ভূত যে কি জিনিস তা আমি বেশ ভালোই জানি। হাড়ের ওপর থেকে মানুষটাকে ছাড়িয়ে নেবার পর হাড়গুলোও ছাড়ালে, যা পড়ে থাকে সেটাই আসল ভূত। আলোয় দেখা যায় না। অন্ধকারে খ্যাসখ্যাসে সাদা দেখায়। অনেকটা খুব পুরোনো দাদুর ছাতার মতন।

আমি জেনেশুনেও বেশ দৃপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে হে?'

ভূতটা কিন্তু সত্যিবাদী। পরিচয় গোপন না করে সরাসরি কাতর গলায় উত্তর দিল, 'হামি একজন ভূত। একটু থাকার জায়গা খুঁজছি একানে। হামি পাঞ্জাব থেকে এসেছি এক বরস হবে। এতোদিন গাছে গাছেই ছিলাম। সামনের ওই জঙ্গলে।'

আমি মনে মনে বললাম, 'ওঃ! তুমি বেটা গেছো ভূত।'

ভূতটা বলে চলল, 'ওখানে ভারি মশা।'

আমি বললাম, 'মশা তো তোমার কী?'

'আমি মশা ভূতেদের কথা বলছি। ওরা খুব জ্বালায়।'

'তাই বল।'

'তা ছাড়া, ওখানে ভূতগুলো ভারি বোকা। খুব বোরিং গপ্ করে। আর কদিন থাকলে পাগল হয়ে যাব।'

এবার আমি সত্যিই ভয় পেলাম। একে ভূত তায় যদি পাগল হয়, তাহলে সাংঘাতিক। আঁচড়ে কামড়ে দিলে শুধু জলাতঙ্ক নয়, সব ধরনের আতঙ্কই হতে পারে।

আমি ভূতটার নাম জিজ্ঞেস করলাম। ভূতটা গদগদ কণ্ঠে নাম জানাল, 'শ্রী গোবিন্দ সিং সেরা।' গোবিন্দ ওর বঙ্গদেশে আগমনের কথা যা বললো তা সংক্ষেপে এই। তিনবছর আগে পাঞ্জাবে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু। তারপর দু'বছর পাঞ্জাবে ভূতগিরি। গত বছরের সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড় তাকে পাঞ্জাব থেকে তুলে এনে বঙ্গে ফেলেছে। তারপর থেকেই আম, জাম, বেলগাছ।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারি না। 'তুমি বাংলা কি আগে জানতে নাকি গত এক বছরে শিখেছ?'

গোবিন্দ বলল, 'মাতৃভাষা গুরুমুখী একদম বলি না। লোকে খনা ভাববে। হিন্দি আমি আগেই জানতাম । বাংলা শিখেছি গত এক বছরে। কী? ভালো শিখিনি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোই শিখেছ। প্রায় আমার হিন্দির মতন।' গোবিন্দ কী বুঝল জানি না কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল, 'তুমি হামাকে এই হস্টেলে থাকতে দেবে? আমি তোমার খুব বন্ধু হব।'

একটা ভূত বন্ধু হস্টেলে থাকলে মন্দ হয় না। আমি একটু ভেবে বললাম, 'থাকতে হয় তো দিতে পারি, কিন্তু তুমি আমার কোন্ কাজে লাগবে শুনি? কী হবে আমার তোমার মতন বন্ধু নিয়ে?'

গোবিন্দ একটু ভেবে বলল, 'আমি ভালো চাষ করতে পারি, গান করতে পারি।'

আমি ধমকে উঠলাম, 'তোমার বোকামি থামাবে গোবিন্দ। ওসব দিয়ে কী হবেটা কী শুনি!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোবিন্দ নিজের বোকামির জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করছে। অল্প সময়ে নিজেকে সামলে নিল গোবিন্দ, 'হামি বহুৎ আচ্ছা দৌড়োতে পারি। লং জাম্প, হাই জাম্প সব দিতে পারি। আর আমার গায়ে ভীষণ জোর। এগুলো তোমার কাজে লাগবে না!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি এই হস্টেলে থাকতে চাইছো কেন?'

গোবিন্দ যেন একটু বিরক্ত হল। 'এখানে ছেলেরা কতো মজার গপ্ করে। তা ছাড়া, ছেলেদের ভয়ে ভূতেরা একদম এদিকে আসে না। একটু নিরিবিলিতে গলা

সাধতে পারব। বললাম না—আমি ভালো গান গাইতে পারি।' গোবিন্দর গলা লজ্জায় টলমল করছে, 'শোনাব নাকি দু'খানা!'

আমি মনে মনে বললাম 'এই মরেছে!' মুখে বললাম 'না।'

'শোনো না দুটো গান, ভালো লাগবে খুব।'

'না।'

'একটা —'

আমি গম্ভীর হলাম। 'না' মাথার ওপর ছাদ আর পেটের রুটির ঠিক নেই এখন মাঝরাত্তির, এটা কি গান শোনাবার সময়। তোমার বীরত্বের পারিচয় যদি দিতে পারো তো তোমাকে এখানে থাকতে দেব, গানও শুনতে পারি দু একখানা।'

গোবিন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। 'তা কী করতে হবে?'

'তুমি সিদ্ধান্ত মুখার্জী নামের ব্রহ্মদত্যিটাকে তো ভালোই চেনো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বরম দত্যিটাই তো ভূতেদের সর্দার।'

'আমি কাল খবর পেয়েছি সিদ্ধান্ত জোচ্চুরি করে একটা ছেলেকে পড়ায় আর স্পোর্টসে ফার্স্ট করে দিচ্ছে। পড়াশোনা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু স্পোর্টসটা মোটেই ছেলেখেলা নয়। ওটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওই মুখার্জীটা ছেলেটার মেসোমশাই ছিল। ওকে একটু শায়েস্তা করতে হবে।'

'এই কাজ —তাহলেই থাকতে দেবে?'

'আলবৎ।' মনে হল গোবিন্দ মনে প্রচুর বল পেয়েছে।

'ঠিক হায়, হাম উসকো মার ডালেগা।'

আমি শঙ্কিত হলাম, 'না না মেরে ডালে দিও না। হস্টেলের ছেলেদের শরীর খারাপ হবে ওই বাসি শুঁটকো ব্রহ্মদত্যি খেলে।'

'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠল গোবিন্দ। আমি বুঝলাম ভুল বলেছি। হিন্দিতেই হট্টগোল।

তাড়াতাড়ি শুধরে নিলাম, 'না না ডাল দিয়ে মারার দরকার নেই, হয়তো মারাই পড়বে শেষকালে।'

আবার হেসে ওঠে গোবিন্দ বিশ্রী খ্যাকখ্যাক করে। 'বাংলায় মেরে ফেলব-কে ভালো হিন্দি জানা লোকে কী বলে বলো তো?'

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এক্কেবারে বেইজ্জত। মনটা আমার হায়এর জন্য হায় হায় করে উঠল। একটা হায়এ বোঝানো যায় বাংলা হায় না হিন্দি হায়। না আর কোনও রিস্ক নেওয়া নয়। 'মারেগা হায়?'

গোবিন্দ হেসে প্রায় পড়ে যাবার দাখিল 'না বাবা না, যারা ভালো হিন্দি জানে তারা ওসব মারেগা ফারেগা বলে না। জোর দেবার জন্য বলে, 'মার ডালে গা'। তুমি দেখছি মোটেই হিন্দি জানো না। আমি বরং পরিষ্কার বাংলায় বলি 'উসকো আমি খুন করিব।'

'না না, খুনটুন করার দরকার নেই। তুমি বরং সিদ্ধান্তকে পাঁজাকোলা করে এখানে নিয়ে এসো। তারপর আমরা দেখব।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মনে হল গোবিন্দ ভাবছে। 'আচ্ছা? পাঁজাকোলা না করে কোকাকোলা করলে হয় না? আমি পাঁজাকোলা চিনি না। কখনও খাইনি। এবার আমার হাসার পালা। এতক্ষণ ভাষার অপমানে গা রিরি করছিল। হা হা করে হেসে গায়ের ঝাল মেটালাম —'তুমি বাংলা শিখেছ না কচু শিখেছ।'

একটু অপ্রস্তুত হল গোবিন্দ, 'কচু বুঝি বাংলার মতোই আরেকটা ভাষা? আমি আগে নামই শুনিনি। নাম না জেনেই শিখে গেলাম? ভারি মজা তো?'

আমি হেসে গড়িয়ে গেলাম, 'আরে তুমি কচু মানেই জানো না, এদিকে বাংলা শেখার বড়াই কর।' পাঁজাকোলার মানেটা আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম গোবিন্দকে।

গোবিন্দ কাঁচুমাচু মুখ করে শুধু বলল, 'ওঃ! ঠিক বুঝেছে মনে হল না। আমি বললাম ওসব থাক। এখন কাজের কথায় আসা যাক। পরশু, মানে রবিবার সকালে স্কুলের স্পোর্টস। শ্যামল আর পটলকে দেখবে ১০০ মিটার ৩০০ মিটার রেসে, হাইজাম্প, লংজাম্পে। আরও অনেকেই স্পোর্টসে ভালো। যেমন—বুবুন, হরি, কল্যাণ, নিমাই, কিন্তু আসল প্রতিযোগী ওরা দুজনে। পটল দৌড়োয় শ্যামলের চেয়ে ভালো, কিন্তু ব্যাটা সিদ্ধান্ত মুখার্জীই শ্যামলকে বারবার জিতিয়ে দিচ্ছে। তোমাকে সিদ্ধান্ত মুখার্জীর জোচ্চুরি বন্ধ করতেই হবে। জেতাতে হবে পটলকে যদি পারো তো হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালো গোবিন্দ 'কিন্তু একটা কথা' মুখার্জীর পেছনে একবার লাগলে আমি আর জঙ্গলে ফিরতে পারব না। ওর অনেক চেলা-চামুণ্ডা। একা ক'টাকে ঠেঙ্গাইব? ছেলেদের ভয়ে ওরা এদিকে আসে না।' একটু দম নিয়ে গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু নামগুলো গুলিয়ে ফেলব না তো? অতগুলো নাম?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভাবনার কথা বটে।'

খানিক ভেবে সাব্যস্ত হল, যে অত মনে রাখার দরকার নেই। যার ওপর সিদ্ধান্ত মুখার্জী ভর করবে তাকে গোবিন্দ পেছন থেকে টেনে ধরবে তাহলেই হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ওজন কতো গোবিন্দ?' গোবিন্দ একটা গর্বের হাসি হাসল, 'পাক্কা এক সের। এ এলাকায় তিনপোর বেশি ওজন আর কোনও ভূতের নেই।'

আমি বললাম, 'লড়ে যাও গোবিন্দ, তুমি ঠিক পারবে।'

শরীরটা স্পোর্টসের দিনও ঠিক চাঙ্গা হয়নি। আমি ঘরের কোণে বসেই ছিলাম। বেলা একটা নাগাদ গোবিন্দ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বেদম হাসতে লাগল। আমি সন্দেহভরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'পটলকে জিতিয়েছ?' গোবিন্দ হাসি থামাল, 'একশো মিটারে হল না।'

আমি চোখ লাল করে রেগে বললাম, 'কেন? হল না কেন?'

গোবিন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া গলায় বলল, 'তোমার বোকামির জন্যেই তো পটল একশো মিটারে হারল।'

আমি একটু থতমত খেলাম, 'ত-তার মানে?'

'আরে তুমি আমায় বলেছিলে সিদ্ধান্ত যার ওপর ভর করে তাকে পেছন থেকে টেনে রাখতে। আমি একশ মিটারে তাই করলাম। কিন্তু একটু পরেই দেখি সিদ্ধান্তও ওকে পেছনেই টানছে। তখনই বুঝলাম সিদ্ধান্ত আসলে শ্যামলকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, পটলকে পিছিয়ে দেয়। দুজনের টানাটানিতে পটল বেচারা এগোতেই পারেনি তিরিশ মিটারের বেশী।'

আমি দোষ ঢাকার জন্যে গম্ভীর হয়ে গলা খাঁকারি দিলাম. 'বাকিগুলোর, কী হল?'

গোবিন্দ হাসিতে ফেটে পড়ল। 'আরে আমি হাত লাগাতেও যখন পটল হারল তখন আমার বহুৎ গুসসা ধরল ঔর জেদ চেপে গেল। পটল কোন্ কোন্ ইভেন্টে নাম দিয়েছিল জানি না; কিন্তু আমি সকলকে পটলের তাক লাগানো তিনশ মিটার হার্ডল রেস, হাইজাম্প, লংজাম্প সব দেখিয়ে স্পোর্টস শেষ করে দিয়ে এলাম।'

আমি অবাক হলাম, 'সে আবার কী রকম কথা?'

গোবিন্দ হাসতে থাকল। 'ছেলেরা ফিরলে পুরোটা শুনো। আমি কম কথায় বলছি।'

তিনশ মিটার রেসে গেমস স্যারের হুইসিল বাজতেই আমি পটলকে নিয়ে দৌড়োতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত বাধা দিতেই ওকে মারলাম এক মোক্ষম ল্যাং। সিদ্ধান্ত ছিটকে পড়ল। পটল যখন তিনশ মিটার শেষ করল তখন শ্যামল সবে মাঝ রাস্তায়। রাগ আর জিদের মাথায় আমি তখন ভেবেই নিয়েছি যে পটলকে সেরা অ্যাথলীট্ বানাবই বানাব। সব ইভেন্টে জিতিয়ে। তিনশ মিটার শেষ হতেই পটলকে কোলে নিয়ে দিলাম এক বিশাল লং জাম্প। পটলকে একটু ক্ষণের জন্য পৌঁছে দিলাম পনেরো মিটার দুরের প্রথম সারিতে, হেডস্যারের টেবিলের সামনে। তারপরেই পটলকে নিয়ে দিলাম তিনটে হাইজাম্প। নারকোল গাছের মাথা থেকে তিনটে ঝুনো নারকোল পেড়ে এনে পটলের হাত দিয়ে বসিয়ে দিলাম সংস্কৃত স্যারেব সামনের টেবিলে। উনি নারকোল খুব ভালবাসেন। পটল ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। ওর কানে কানে বললাম কুছ ডর নহি, গোবিন্দ তোমার সহায়, শুধু মনে ভাব তুমি নিজেই সব করছো।

স্যারেদের এই এক দোষ। বড় অকারণে বিচলিত হয়ে পড়েন। কেন তা কে জানে বেশী পড়াশোনা করেন বলে বোধ হয়। হেডস্যার হুকুম দিলেন পটলকে ধরতে। ছেলেরা সব ছুটে এল আমাদের দিকে। তখনই ওদের দেখিয়ে দিলাম হার্ডল রেস কাকে বলে। আমি আর পটল লাফাতে লাগলাম সকলের মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। ধরে কার সাধ্য। কখনও তিনতলার কার্নিসে কখনও নারকোল গাছের মাথায়।

আমার আরও স্পোর্টস দেখানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু সকলের মুখ দেখে কেমন সাহস পেলাম না। সকলেই মনে হল ভয় পেয়েছে। হাইজাম্প লংজাম্প একটু বেশী ভালো হলে যে ভয় পাবার কী আছে তা কে জানে।

হেডস্যার কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন। 'স্পোর্টস্ আজকের মতন এখানেই শেষ। বাবাগো' বলেই মূর্ছা গেলেন হেডস্যার।

আমি এতোক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলাম, এবার বললাম, 'এটা কিন্তু খারাপ কাজ হল গোবিন্দ, হেডস্যার কতো ভালো লোক জানো? ছেলেদের কতো ভালোবাসেন?'

গোবিন্দ মুখ চুণ করল, 'তা আর জানিনে? ভালোবাসেন বলেই তো কাউকে ছাড়তে চান না। একেক কেলাসে রেখে দেন দু তিন বছর। আমি ওটা করতে চাইনি কিন্তু উপায় ছিল না। আমাকে আর কেউ দেখুক আর নাই দেখুক সিদ্ধান্ত দেখেছিল। তেড়ে এসেছিল আমার দিকে কিন্তু আমার সঙ্গে পাঁয়তাড়া, ঝাড়লাম আরেকটা মোক্ষম ল্যাং। সিদ্ধান্ত উড়ে গিয়ে পড়বি তো পড় হেডস্যারের ঘাড়ে। আমি ডাইভ দিয়েও বাঁচাতে পারলাম না। ভূত দড়াম করে বা ধড়াস করে ঘাড়ে এসে পড়লে দমকা হাওয়ার ঝাপট লাগে, ওইজন্যেই তো কথায় বলে হাওয়া লেগেছে। হেডস্যার হাওয়ার চোটে বাবাগো বলেই....'

আমি গোবিন্দকে সান্ত্বনা দিলাম, 'মহৎ কাজে অমন একটু আধটু এদিক ওদিক হয়েই থাকে।'

গোবিন্দ আমায় থামিয়ে দিল, 'ঠিকই, আরো এক আধটা এদিক ওদিক হয়েছে।'

আমি উদ্বিগ্ন হলাম, 'আবার কী হল?'

'তেমন কিছু না। সংস্কৃত স্যার পৈতে বার করে রামনাম জপতে যাচ্ছিলেন। দেখেই তো আমার প্যালপিটেসন শুরু হয়ে গেল। নিজেকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি পৈতেটা ওঁর গলায় জড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। দমবন্ধ হয়ে বিষম খেয়ে উনি একটু জ্ঞান হারালেন। আর গেমস্ স্যার, যাঁর অত দাপট তিনি যে গলায় হুইসিল আটকে ফেলবেন সেটা জানব কী করে শুনি!'

'আঃ হুইসিল তো গেমস স্যারের গলাতে আটকানোই থাকে।'

'সে তো বাইরে থাকে। এখন যে ভেতরে। ছেলেরা ভেবে পাচ্ছে না হজমের ওষুধ দেবে না টেনে বার করবে। গেমস স্যার হুইসিল গিলে ফেলেছেন। আচমকা।' আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম, 'সাংঘাতিক কাণ্ড। একেবারে কেলেঙ্কারি।'

'কেলেঙ্কারি আবার কী! হয় মানুষই থেকে যাবে নয়তো আমার মতন হবে। তুমি এবার কাজের কথায় এসো। আমাকে এখানে থাকতে দেবে তো!'

আমি বললাম, 'কেলেঙ্কারি যাই হোক তুমি তোমার কাজে সফল। সাবাস তুমি গোবিন্দ সিং সেরা। তুমি আজ থেকে আমার সঙ্গে এই ঘরেই থাকবে। তোমার পদবী সেরা, তুমি স্পোর্টসে সেরা, তুমি ওজনে এক সেরা। আজ থেকে তোমার নাম সেরা ভূত!'

সেরা ভূত ভয়ে ভয়ে শুধোলো, 'অন্যভূতেরা এই নাম মানবে তো!'

এবার আমার সত্যিই ভীষণ রাগ হল। কর্কশ গলায় বললাম, 'মানবে না মানে? জানো আমি এই এলাকার ভূত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অমলেশ ভট্টাচার্য। ভূতেরা যে এদিকে আসে না সেটা ছেলেদের ভয়ে না, আমার ভয়ে।'

গোবিন্দ গদগদ গলায় হাত কচলালো। 'সব জানি বলেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার।'

টি. টির সঙ্গে খিটি মিটি

টি. টি, মানে টিকিট চেকার আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। ওরা ভীষণ লোভী হয়। খালি খালি অন্যের জিনিস চায়, তা নিজেদের যতোই থাকুক না কেন। বড় বড় সব মানুষেরা, মানে বুদ্ধদেব, চাণক্যের মতন সব লোকেরা লোভী হতে কতো বারণ করেছেন সেকথায় আদপে কানই দেয় না। কথায় বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। ও বেটারা একদিন না একদিন ঠিক মরবে। কেন যে ওদের টি. টি বলে কে জানে। ওদের নাম টি টি. না হয়ে টি. টি. হওয়াই ভালো।

টি টিরাও আমাকে মোটে দেখতে পারে না। দেখলেই টিকিট চায় আর চোখ পাকায়। নিজেদের হাতে একরাশ টিকিট। তাও চায়। বললাম না — লোভী, শুধু আমার নয় সক্কলের টিকিটগুলোই ওদের চাই। বোকাও আছে কিন্তু। কোথায় ডাক টিকিট জমাবে, না ট্রেনের টিকিট জমায়।

আমার কাছে যে টিকিট কক্‌খনো থাকে না সে কথা ঠিক না। ট্রেনে আমার সঙ্গে মামা কাকা থাকলেই থাকে। টি. টি. ছোঁক ছোঁক করার আগেই নাকের ওপর টকাস্

করে টিকিট ছুঁড়ে দিই আমরা। কিন্তু রোজ তো আর সঙ্গে মামা কাকা রাখা সম্ভব না। তখনই আমায় খুঁজতে হয় টিকিট কোন পকেটে আছে।

আজকাল আমি যে জামাপ্যান্ট পরি তাতে গরমকালেই ষোলটা পকেট। শীতকালে সাড়ে সাতাশটা। একটা পকেট আধ ছেঁড়া হয়ে গেছে। এতোগুলো পকেট খুঁজতে বেশ সময় লাগে। মাঝরাস্তায় গুলিয়েও যায়। আবার শুরু করতে হয় প্রথম থেকে। টি. টি. সামনে দাঁড়িয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে, আমার খোঁজা দেখে। আমি পকেট থেকে লাট্টু লেত্তি, বাসি আলুর চপ, পুরোনো চুইংগাম, সর্দি মোছার রুমাল সব ওকে ধরতে দিই, ভালো করে খোঁজার জন্য। প্রায়ই ও রাজী হয় না। আমি পষ্ট জানিয়ে দিই, যে মাটিতে রাখা সম্ভব না, ওসব দামী জিনিস। বিশেষতঃ চুইংগামটা। মাটিতে একবার নামালে তো আর চিবোনোই যাবে না। টি. টি. খোঁজা দেখতে দেখতে হাই-তোলে, কান চুলকায় (হাত খোলা থাকলে) তারপর ষোলটা পকেট মাত্র তিনবার খোঁজা হবার আগেই সে 'ধুত্তোর' বলে চলে যায়। আরে বাবা টিকিট আছে কি নেই সেটা সাব্যস্ত হতে একটু সময় লাগবে না!

আমার কাছে খুঁজে খুঁজে টিকিট যে সর্বদাই পাওয়া যায় তা অবশ্য না। দোষটা রেল কোম্পানির। আমরা তো আর হাওড়া শেয়ালদার মতন বড় স্টেশন থেকে ট্রেন ধরি না। আমরা গাড়ি ধরি আমাদের ছোট স্টেশন মানে—ইস্টিশন থেকে, কথাটা কিন্তু আমি ডিক্সনারিতে পাইনি, যা সব বড় বড় মোটা মোটা ডিক্সনারি আমাদের বাড়িতে। স্টেশন আছে ইস্টিশন নেই। সক্কলে জানে ছোট স্টেশনকে ইস্টিশন বলে। বড়ো ডিক্সনারির দেমাক বেশী, ছোটদের কথা লিখতে ভুলে যায়। একটা ছোট ডিক্সনারি দেখতে হবে।

সত্যিই দোষটা রেল কোম্পানির। বেশী লোক দিলেই পারে ইস্টিশনে। টিকিট বিক্রী করার জন্য।

ইস্টিশনে রেলের লোক বলতে তো শুধু ইস্টিশন বাবু আর ভজুয়া। ভজুয়া একাই ইস্টিশনবাবুর ঠাকুর, চাকর, ঝি, বামুন, রাখাল বালক, টিকিট বিক্রীর লোক এবং ঘণ্টাবাদক। সব একসঙ্গে। একই অঙ্গে। সারাদিনে চারটে মোটে ট্রেন। ইস্টিশনবাবু জেগে থাকলে ভালো, নাহলে ভজুয়াই কাজ চালিয়ে দেয়। প্রথমে রাখাল বালকের মতন ইস্টিশনবাবুর গরু ছাগল মুরগীদের তাড়িয়ে একপাশে নিয়ে যায় যাতে কাটা-টাটা না পড়ে। তারপর আগের ইস্টিশনে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দেয়। তেমন সুযোগ সুবিধে হলে আর কারুর প্রতি টিকিট কাটতে পারে এমন সন্দেহ জাগলে, টিকিট কাউন্টার খুলে বসে পড়ে ভজুয়া।

ভজুয়ার সন্দেহটা বেশির ভাগ সময়েই ভুল হয়। আমি বহু দিন দেখেছি। ট্রেন আসে ভুস ভুস করে। কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। ঠাসা লোক নিয়ে। লোক নামে, লোক ওঠে, ঝালমুড়ি, চা, শশা খায়। ঝগড়া করে, টাটা করে কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে তেমন একটা কেউ এগোয় না।

ইস্টিশনের কোণে একটা লোক যা ম্যাজিক দেখায় না! তাক্ লেগে যাবে। একটা ছোট্ট রুমালের ভেতর থেকে কলা, খরগোশ, পায়রা এমনকি মুরগি পর্যন্ত বার করতে পারে। আমাকে বলেছে আরেকটু বড় হলে ওর অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে নেবে। আমরা সকলে মশগুল হয়ে ম্যাজিক দেখি।

ভজুয়াকে পাঁচ মিনিটেই ঝাঁপ বন্ধ করতে হয়। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সে ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা দেয়। তারপর গার্ড দেয় পীঁ....করে হুইসিল আর ইঞ্জিন দেয় প্রচণ্ড এক ভোঁ। ভোঁএর আওয়াজে আমাদের সংবিৎ ফেরে। আমরা তাকিয়ে দেখি টিকিট ঘর বন্ধ। এক ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠি ট্রেনে। ইঞ্জিন একটা হু...শ করে হাঁফ ছেড়ে ভুস ভুস করতে করতে চলে যায় বহুদূর।

ভজুয়া দৌড়ে গিয়ে ইস্টিশনবাবুকে জানায়। 'ঝাঁঝরা লোকাল ছেড়ে এলাম স্যার।'

ইস্টিশনবাবু পাশ ফিরে শুতে শুতে বলেন, 'গরুগুলোকে তাহলে দুয়ে ফেল এইবার আর...'

তাহলে—!

আমরা টিকিট কাটবোটা কী করে শুনি? ট্রেনে উঠব না টিকিট কাটব? বলি দোষটা কার? 'আমাদের না রেল কোম্পানির?'

আজকের টি. টি. টিকে দেখেই আমার মেজাজ চড়ে গেল। এ লাইনে যতো টি. টি. আছে এটিই আমার মতে সবচেয়ে খারাপ। যেমন বদ, তেমনি লোভী। যেমন বদখত্ দেখতে তেমনি বিশ্রী খ্যাঁচখ্যাচে মেজাজ। মাথা জোড়া টাক, গালের ওপর লম্বা জুলফি। চোখ দুটো দুটাকা সাইজের রসগোল্লার মতন। ভুরু দুটো সদাই কুঁচকোন। জামরুলের মতন নাকটার থেকে অজস্র চুল বেরিয়ে আছে। নাকের তলার গোঁফ জোড়া ঠিক যেন দুটো খ্যাংরা ঝাঁটা। কালো কোটের বোতামের ফাঁকে ফাঁকে গেঞ্জিতে ভরা ভুঁড়ি চলকে পড়ছে। গম্ভীর হয়ে থাকলে ঘটৎকচের মতন, হাসলে বকাসুর।

টি. টির আমার দিকে তাকানো দেখে মনে হল আবছা মনে পড়ছে আমার মুখটা, কিন্তু জায়গামাফিক বসাতে পারছে না। সেদিনও আমি ষোলটা পকেট হাতড়াচ্ছি বারবার, টিকিটের আশায় আর এই টি. টি. আমার পকেটের সব জিনিস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য টি. টি. হলে, বার দুই পকেট হাতড়ানোর পর ধুত্তোর বলে পাশের লোকের দিকে চলে যেত। কিন্তু এই টি. টিটা এমনই ঢ্যাঁটা যে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চোখ দুটো আলুবখরার মতন করে, হারমোনিয়ামের রিডের মতন সাদাকালো দাঁতের সারি বার করে হেসে বলল, 'খোঁজা শেষ হলে আমার সঙ্গে যেতে হবে। টিকিটটা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

অনেক কষ্টে টিকিটটা খুঁজে পেয়ে টি. টির হাতে দিলাম। সে নেড়েচেড়ে একটু হাসল, 'টিকিটটা দুমাসের পুরোনো।' বলেই স্টেশনের একরাশ লোকের মাঝখানে আমায় নামিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

মিথ্যে বলব না। আমার খু.....ব ভয় করছিল। নির্ঘাত জেলে নিয়ে যাচ্ছে। কতো লোক দেখছে, আমার নেহাত লজ্জা করার বয়স হয়নি, নাহলে লজ্জাও করত খুব।

টি. টি. অবশ্য শেষ অবধি আমাকে নিয়ে যেতে পারেনি। আমি খুব ডাঁসা পেয়ারা খাই তো, তাই। পেয়ারা খেলে দাঁতের জোর বাড়ে সেটা অনেকেই জানে না। টি. টি. টিও মনে হয় জানতো না।

হাতেনাতে জানিয়ে দিয়ে সটকে পড়লাম। টি. টি. 'বাবাগো' বলে হাত চেপে বসে পড়ল। কিন্তু বলেছি না অসভ্য। পেয়ারা খেলে দাঁতের জোর বাড়ে, এত বড়ো শিক্ষালাভের বদলে একটা ছোট ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না।

সেই টি. টির সঙ্গে দেখা আজ বহুদিন পরে। উঁকি মেরে দেখলাম হাতের ওপর দাঁতের দাগটা প্রায় মিলিয়ে গেছে। আমার মুখটা আবছা ওর মনে আছে, ঝাপসা দাগটারই মতন। কিন্তু ঘটনাটা মনে নেই। অমন ঘটনা নির্ঘাত নিত্য ঘটে। টি. টি. টি কিন্তু টিকিট চাইবার আগেই আমার দিকে টোম্যাটোর মতন চোখ করে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'স্যুটকেসটা প্যাসেজে রেখেছ কেন? সরিয়ে রাখ।'

এমন খ্যাঁকখ্যাঁক করে কথা বললেই আমার মেজাজ ভীষণ চড়ে যায়। মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে। রগের কাছটা দপদপ করে। স্যুটকেসটা সত্যিই খুব ভারি। অন্য টি. টি. হলে আমি সরাতাম না। কিন্তু আমারও তো মনে আছে এই টি. টি. টিকে।

স্যুটকেসটাকে প্রাণপণে টেনে একটু সরিয়ে দিলাম।

টি. টি.র মুখের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। মানে মুখবিকৃতি একই রকম রইল। 'ওটুকু সরালে হবে না। বাক্সটা এখান থেকে তুলে ওদিকে নিয়ে যাও। এটা লোকের যাতায়াতের রাস্তা। মানে প্যাসেজ।'

আমার এবার লোম খাড়া হয়ে উঠল রাগে, শিরার ভেতর রক্তেরা আরও জোরে জোরে চলতে লাগল। আমি বললাম, 'আমি এর বেশী পারব না, দরকার হয় আপনি নিজে সরিয়ে রাখুন।'

আমার কথাগুলো টি. টি. গায়ে মাখল, 'সরাতে তোমাকে হবেই। এটা প্যাসেজ। লোক যাবার রাস্তা। তোমার মামাবাড়ি না।'

আমারও জেদ চেপে গেল, 'বললাম তো সরাতে পারব না, মানে সরাব না। আপনি কী করতে পারেন আমি দেখব। আমার মামাবাড়ি না হলেই কি আপনার মামাবাড়ি?'

'আচ্ছা বেয়াদব তো!'

'আপনি টিকিট দেখতে এসেছেন টিকিটই দেখুন। বাক্স নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আর প্যাসেজের কথা বলছেন! আপনি নিজেই তো প্যাসেজ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন গন্ধমাদনের মতন, কেউ যেতে আসতে পারছে না। আপনি বরং কাত হয়ে দাঁড়ান। লোকেদের চলাফেরা করতে দিন।'

'এতো বড় কথা! জানো আমার নাম শিবলাল টি. টি.! জানো আমি কি করতে পারি!!!'

'আমার জানার দরকার নেই।'

টি. টি. ফস করে পকেট থেকে একটা পাঁজির মতো বই বার করল, 'দেখবে কি কি করতে পারি আমি।'

আমি এবার একটু ভয়ই পেলাম। অবশ্য মুখে দেখালাম না।

বইয়ের পাতা ঘেঁটে টি. টি. দেখাল —'এই দেখ দুশো বাইশ নম্বর, এমন ক্ষেত্রে তোমার লটবহর আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি ট্রেন থেকে।'

আমারও একবার জেদ চেপে গেলে সাংঘাতিক। আমি বললাম, 'এটা আপনার মামাবাড়ি না। ফেলে দিয়ে দেখুন না একবার কী হয়। আপনাকেও এই রাস্তায় রোজ টি. টি. গিরি করতে হয় সে খেয়াল আছে?'

আমাদের কথা কাটাকাটি শুনে প্যাসেজে দাঁড়ানোরা ছাড়াও প্রচুর লোক জমে গেছে। এক বৃদ্ধ বললেন, 'কী দরকার ভাই। বাক্সটা আরেকটু সরিয়েই রাখো না। তাহলেই ওঁর রাগ পড়ে যাবে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা অস্ফুট গলা ভেসে এল। 'এ নির্ঘাত উগ্রপন্থী। বাক্সটা বেশী সরাতে বলবেন না দাদু। ভেতরে নিশ্চয় বোমাটোমা আছে। আমরা সক্কলে একসাথে উড়ে যাব।'

আরেকজন বলল, 'ঠিক বলেছেন দাদা। টি. টি. ওটাকে বাইরে ফেলে দিলেই ভালো। বাইরে ফাটবে।'

আমার পাশে একজনই মাত্র লোক, যাকে সত্যিই ভদ্রলোক বলা যায়। মানে যথার্থ ভদ্রলোক। তিনি আমার পক্ষ নিলেন, 'এঁঃ......! ওঁর বইয়ে লেখা থাকলেই হল! যার খুশি, যা খুশি, যখন খুশি টি. টি. বাইরে ফেলে দিতে পারে!! আমি উকিল। বাইরে ফেলুক দেখি না। মামলা ঠুকে দেব। এমন হামলা করব, যে ঘটি বাটি গামলা বেচতে হবে। ওই আমড়ার মতন দামড়া মুখ আর ঝাঁটার মতন গোঁফ দেখে সক্কলে ভয় পায় না।' টি. টি. এতক্ষণ শুনছিল আর রাগে ফুঁসছিল। ওর কান লাল, চোখ লাল, নাক লাল। এক কথায় শিবলালের সব লাল। টি. টি. আমাকে শেষবারের মতন বলল, 'কি? সরাবে কি না?'

বলেছি না আমার জেদও সাংঘাতিক। আমি বললাম, 'না, মানে সোজা বাংলায় না।'

আরেক বৃদ্ধ বলতে যাচ্ছিলেন, 'আহাহা মিটিয়ে নিলেই তো হতো, এই অল্প জায়গা নিয়েই না কুরুক্ষেত্র......'

তাঁর কথা শেষ হল না। টি. টি. দাঁত মুখ খিঁচিয়ে স্যুটকেসটা দুহাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কামরার বাইরে পাশের লাইনে। ট্রেন তখন সবে ঢুকছে কুমারডাঙা। ইস্টিশানে।

আমি এদিকে চলে এলাম।

হোঁৎকা মতন লোকটা যে কী করে এতো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল তা কে জানে। উঠেছে তো মাত্র দুটো স্টেশন আগে। সকলে পারে না, কেউ কেউ পারে। বাঙ্কে উঠে শুলেই সাউণ্ড স্লিপ। মানে ঘুমের সঙ্গে সাউণ্ড। নাক ডাকার শব্দ।

আমি একটু ডিঙি মেরে লোকটাকে ডাকতে লাগলাম—

'ও দাদা শুনছেন।' জবাব নেই।

'ও মশাই শুনছেন।' জবাব নেই।

'ও মামাবাবু শুনছেন।' জবাব নেই।

'ও জামাইবাবু শুনছেন।' জবাব নেই।

জামাইবাবুটাই কিন্তু চিচিং ফাঁকের মতন একটু কাজ করল। লোকটা বাঙ্কের ওপর ওপাশ ফিরে শুল। পাশ থেকে একজন বলল, 'অভিমান করল বোধ হয়। তোমার মতন পুঁচকে ছোঁড়ার মুখে জামাইবাবু শুনে। তুমি ওকে প্রথম দুটো, মানে দাদা আর মশাই জুড়ে ডাকো নিশ্চয়ই উঠবে।'
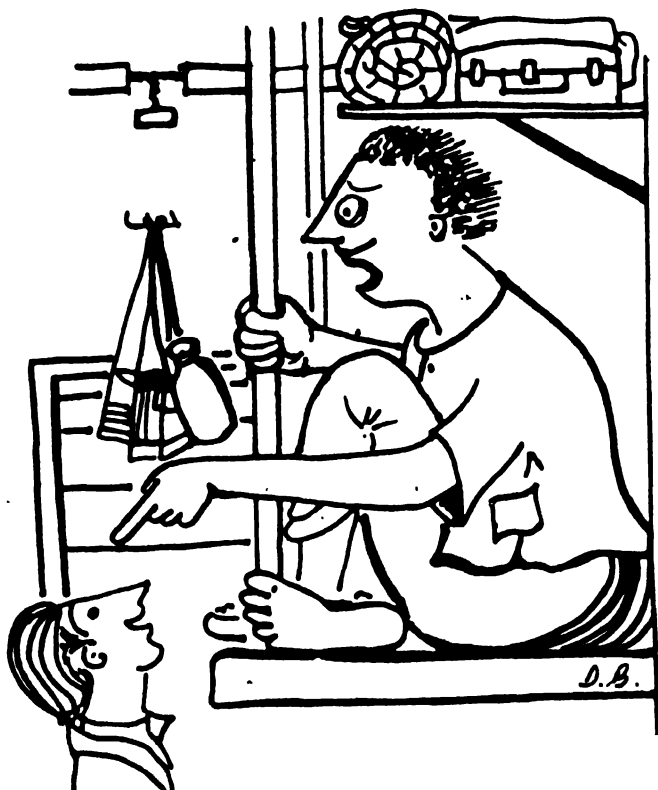
ঘুমের ভেতর অভিমান হয় কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু 'দাদামশাই' বলে ডাকতেই লোকটা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর তড়াক করে উঠে বসে সেই আগের মতন গর্জন করে উঠল। 'আবার ফাজলামো! একটি চড়ে তোমার বদন—'

আমি বাধা দিলাম, 'ফাজলামী এবার আমি করিনি, ওই লোকটা করেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিল আপনার বাক্সটা।'

'কে কার কী ছুঁড়ে ফেলল আমাকে জানাবার তোমার...' লোকটা হোঁচট খেয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়াল, তারপর একটা নবীন ডাইনোসরের মতন গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমার বাক্স ফেলে দিয়েছে! কার এত সাহস!! আমি দেখব!!!'

আমি টি. টির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই তো দেখুন না। ওই কালো কোট পরা টমেটো মার্কা টি. টি.। আপনার বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কারও কথা শুনল না। একটু আগে আপনি যখন স্যুটকেসটা দমাস করে আমার পায়ের ওপর রাখলেন, আমি কতোবার আপনাকে বললাম ওটা প্যাসেজ থেকে সরিয়ে রাখতে। শুনলেন না। পায়ে ব্যথা তো দিলেনই তার ওপর তর্জন গর্জন করলেন।

আমি আপনাকে একটু আগে যে কথাগুলো বলেছিলাম টি. টি. উঠেই আমাকে ঠিক সেই কথাগুলোই বলল। আর আমাকে আপনি তখন যা যা বলেছিলেন হুবহু সেই কথাগুলোই আমি টি. টি.-কে বললাম। তাতে লোকটা খামোকা রেগে গিয়ে আপনার বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এতোগুলো হাঁ আমি একসঙ্গে আমার চারপাশে কখনও দেখিনি। ট্রেনটা প্ল্যাট-ফর্মে ঢুকছিল। স্যুট করে নেমে পড়লাম। পায়ে তেমন কিছু লাগেনি।

যাক্ বাঁচা গেল। ষোলটা পকেট তিনবার খুঁজতে হল না।

যা বোরিং লাগে।

কুকুর প্রভুভক্ত জীব

রবিবার, বেলা তখন প্রায় দেড়টা, নীচ থেকে ছোটমামার গলা পেলাম 'পেনো—এই পেনো—শিগিগির দেখে যা কী এনেছি।' ছোটমামার কথা শেষ হতেই বেশ কটা 'ভৌ' শোনা গেল। ছোটমামী তাড়াতাড়ি রান্নার হাঁড়ি নামিয়ে, ধোয়া হাত কাপড়ে মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। অবাক মুখে তাকাল আমার দিকে। 'ভৌ' দিয়ে কী হয় বল তো পানু? কী আনল কী তোর ছোটমামা?'

আমি মনের ডিক্সনারিটা একবার হাতড়ালাম 'ভৌ দিয়ে — ভৌতিক, ভৌগোলিক, ভৌমিক—'

পরের 'ভৌ' টা হল ভীষণ জোরে একেবারে আমাদের পেছনে। আমি আর ছোটমামী আঁতকে উঠে ডিগবাজী খাচ্ছিলাম আর কী। ছোটমামা চুপিসাড়ে উঠে এসেছে দোতলায়। বগলে একটা কুকুর। একগাল হেসে ছোটমামা বলল,'ভৌ দিয়ে কী হয় বলতে পারলি না। ভালো করে চেয়ে দেখ রে,ভালো করে চেয়ে দেখ। ভৌ দিয়ে হয় অ্যালসেসিয়ান।'

ছোটমামী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুব জোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। কিছু বলল না। ছোটমামা একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী? হাসলে যে?’

‘তা হাসব না! একটা মড়াখেকো দিশি খেঁকি কুকুরকে অ্যালসেসিয়ান ফ্যালসেসিয়ান যা তা বলছ—হাসব না তো কি!’

‘আলবৎ ওটা অ্যালসেসিয়ান।’ ছোটমামাকে একটু নার্ভাস লাগল। ‘কতো দাম নিয়েছে জানো—পাক্কা তিনশ।’

‘অ্যালসেসিয়ান দূরের কথা ওটা ক্যালকেসিয়ানই না। মানে কলকাতার কুকুরই না। কেমন বিহার বিহার গন্ধ বেরোচ্ছে।’

ভেংচে উঠলো ছোটমামা, ‘বিহার বিহার গন্ধ বেরুচ্ছে। ওটা পাক্কা অ্যালসেসিয়ান। যে লোকটা বিক্রী করেছে তার কী বিশাল দাড়ি—। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। বলে দিয়েছে ভেজাল প্রমাণ করতে পারলে মূল্য ফেরত।’

‘ঠিকানাটা রেখেছ তো?’

মাথা চুলকোল ছোটমামা।

‘তা রাখবে কেন? বুঝলি পানু আমরা হলাম শ্রীরামপুরের মেয়ে। আমাদের অ্যালসেসিয়ান চেনাচ্ছে। আমাদের ওখানে ঘরে ঘরে ইয়া কেঁদো সব অ্যালসেসিয়ান কিলবিল করছে। রাস্তায় একটা দিশি কুকুর দেখবে না তুমি। সর্বত্র অ্যালসেসিয়ানের চাষ।’

আমি এতোক্ষণ একবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কিছু বলার কোনও ফুরসতই পাইনি। ছোটমামীকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমাদের অ্যালসেসিয়ান কী খায় গো?’

‘সাধারণত চোর ডাকাতই খায়’ বলেই থতমত খেল ছোটমামী। তারপর ‘ওই যাঃ! বৃষ্টি আসছে কাপড়গুলো তোলা হয়নি’ বলেই দৌড় লাগালো ছাদের দিকে।

ছোটমামা মুখ গোঁজ করে কুকুরটা অ্যালসেসিয়ান কিনা ভাবছিল। আমি একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, ‘পেছনের দিকটা কিন্তু প্রায় অ্যালসেসিয়ানেরই মতন। অ্যালসেসিয়ানেরও লেজ থাকে। আমি পষ্ট দেখেছি। আর এ পাড়ায় ওকে এনে ভালোই করেছ। ভালো মিশতে পারবে। পাড়ার কুকুরদের সঙ্গে ওর মুখের যেন বেশ মিল আছে। কি নাম গো অ্যালসেসিয়ানটার?’

আমার সান্ত্বনায় ছোটমামা ঠিক কতোটা শান্ত হল বোঝা গেল না। বলল, ‘যুধিষ্ঠির। ও এখনও ছোট আছে। ওকে অনেক কিছু শেখাতে হবে।’

আমি সান্ত্বনা চালাতে থাকি, ‘কেন? দিব্যি তো ভৌ-ভৌ করতে আর লেজ নাড়াতে শিখে গেছে। খেতেও শিখেছে নির্ঘাত। তুমিই শেখালে? না কি আগের মালিকই সব.....’

আমাদের কথা শেষ হল না, হঠাৎ আঁ আঁ করে বিকট চিৎকার ভেসে এলো দিদুর ঠাকুরঘর থেকে। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি হুলুস্থুলুস কাণ্ড। ঠাকুরঘরের ভেজানো

দরজা ঠেলে যুধিষ্ঠির অর্ধেক শরীর গলিয়ে দিয়েছে ভেতরে। আমরা দরজা খুলতে দিদু ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল —'এটা কোত্থেকে দোতলায় এল। এক্ষুণি বার করে দে বাড়ি থেকে। ঠাকুরের কোষাকুষি চেটে ছিষ্টি একশা করে দিয়েছে। ও ঠাকুর গো কী হবে গো।' ছোটমামা যুধিষ্ঠিরকে বার করে আনল ঠাকুরঘর থেকে। যুধিষ্ঠিরের তেমন ভাবান্তর দেখা গেল না। ওর মুখ দেখে মনে হল কোষাকুষি খেতে মন্দ না। সময় মতন একটু চেটে দেখলে হয়।

দিদু ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে তখনও আর্তনাদ করছিল, 'বার করে দে এক্ষুণি, হতভাগা দিলে সব একশা করে।'

ছোটমামী চেঁচামিচি শুনে, সব ফেলে দৌড়ে এসে মুখ টিপে হাসছিল। 'আপনার ছেলে কিনে এনেছে মা। এক্ষুণি বার করে দিলে বেচারার কষ্ট হবে। সবে বিহার থেকে এসেছে....'

যুধিষ্ঠির থেকে গেল। আমার ঘরের মাটিতে ওর শোবার ব্যবস্থা হল। ছোটমামা বাজার থেকে মাংসের ছাঁট আনল যুধিষ্ঠিরের জন্য। আমায় বলল, 'বুঝলি পানু অ্যালসেসিয়ানে মাংস ছাড়া বিশেষ কিছুই খায় না।'

যুধিষ্ঠির কিন্তু দেখা গেল মোটেই গোঁড়া না। বেশ উদার প্রকৃতির। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির অ্যালসেসিয়ানই হোক আর ক্যালকেসিয়ানই হোক খুব বুদ্ধি আছে। দিদু পেসাদের থালা হাতে ঠাকুরঘর থেকে বেরোতেই পেসাদের থালার দিকে ভক্তিভরে ব্যাকুলভাবে চেয়ে, আকুলিবিকুলির সঙ্গে এমন গা মোচড়াতে শুরু করে দিল যে দিদু একগাল হেসে বলতে বাধ্য হল, 'নাঃ! যতোটা ভেবেছিলাম ততো বেয়াড়া না। ভক্তি শ্রদ্ধা আছে।' পেসাদের থালাটা মেঝেতে উপুড় করে দিল দিদু। ছোটমামী মুখ টিপে হাসল, 'পাক্কা অ্যালসেসিয়ান যে মা। শশা দেখে লাফাবে না! আর জন্মে হয়তো ছাগল ছিল। মা কালীর কাছে বলি যাবার আগে প্রসাদ খাওয়ার কথা মনে আছে।'

ছোটমামা কোমরে হাত দিয়ে কটমট করে তাকাল, কিছু বলল না। যুধিষ্ঠিরের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। সকালটা শুরু করেছিল জেলি পাঁউরুটি দিয়ে। প্রসাদের শশা থেকে সন্দেশ, সব খেয়ে জিভ চাটতে চাটতে লেজ নাড়িয়ে ঠাকুরঘরের দিকে চেয়ে রইল আরও প্রসাদের আশায়। দুপুরবেলা কড়ায়ের ডাল, ভাত, পোনামাছের ঝাল, মাংস সবই তারিয়ে তারিয়ে খেল যুধিষ্ঠির, তারপর একটা ঘুম লাগাল। কুকুরের যে অতো ভোঁসভোঁস করে নাক ডাকে সেই আমি প্রথম জানলাম।

শেখার কথা ছিল যুধিষ্ঠিরের আর শেখানোর কথা ছিল ছোটমামার। কিন্তু শিখতে লাগলাম আমি। ছোটমামা কোথা থেকে চারপাঁচখানা বাংলা ইংরিজি কুকুরের বই জোগাড় করে আনলো। তারপর শুরু হল কুকুর সম্বন্ধে একটানা জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ। কদিনেই যা শিখলাম তাতে আমি সর্বদাই কুকুরের স্বপ্ন দেখি। কুকুর সম্বন্ধে রচনার পর রচনা, বইয়ের পর বই লিখতে পারি।

অনেকেই জানে না যে কুকুরকে উচ্ছে খাওয়াতে গেলে জলাতঙ্ক হয়। কারণ কুকুর উচ্ছে তো খায়ই না উল্টে কামড়ে দেয়। কুকুর যে শুধু গন্ধ পায় একথা ঠিক

না। কুকুর দুর্গন্ধও পায়। দুর্গন্ধওলা লোক বা দুর্গন্ধওলা জায়গা কুকুর একদম পছন্দ করে না। কুকুরের প্রিয় খেলা এঁটুলি। এঁটুলিদেরও প্রিয় খেলা কুকুর। উভয়েরই উভয়কে অত্যন্ত প্রয়োজন। কুকুর রাতের অন্ধকারে দেখতে পায় তা সকলের জানা, কিন্তু ওরা দিনের বেলায়ও দেখে। কুকুরের দাড়ি গজায় না ছাগলের মতন। ওদের মুখের ওপর মাকুন্দ বলা চলে। কুকুরের জিভে আওয়াজ থাকলেও তেমন ভাষা নেই। কুকুরের সব ভাষা পেছন দিকে। লেজে। কুকুর রেগে গেলে লেজ খাড়া করে, ভয় পেলে লেজ গুটিয়ে নেয় আর আনন্দ বা আহ্লাদ হলে লেজ নাড়াতে থাকে। সারাদিন নাড়ালেও ব্যথা হয় না। কুকুর পাহারা দিতে খুব ভালোবাসে। সাধারণত ওরা বাড়ি পাহারা দেয়। বাড়ি না পেলে রাস্তা পাহারা দেয়, রাস্তাও না জুটলে হাতের কাছে যা পায় তাই পাহারা দেয়।

কুকুর অতি প্রভুভক্ত জীব। ওরা গরু, ঘোড়া বা হাতির মতন নয় যে শুধু দুধ, দই বা দৌড় দিয়েই ক্ষান্ত হবে। প্রভুর জন্য ওরা প্রায়ই প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

জ্ঞানী লোকেরা যে বইয়েতে বাজে কথা লেখে না তা যুধিষ্ঠির আমাদের মাঝে মধ্যেই বুঝিয়ে দেয়।

সেদিন ছোটমামী বস্তাওয়ালা লোকটাকে ডেকেছিল ভাঙা শিশিবোতল আর পুরোনো কাগজ বেচবে বলে। লোকটাকে দেখেই যুধিষ্ঠির গেল খেপে। ভুরু কুঁচকে, গনগনে চোখে লেজ খাড়া করে গরগরে আওয়াজ শুরু করল যুধিষ্ঠির। কাগজওলা একটু ইতস্তত করছিল, আমি যুধিষ্ঠিরকে চেপে ধরাতে সাহস পেয়ে কাগজ ওজন করতে বসল। যুধিষ্ঠির কিন্তু সমানে চোখ পাকিয়ে ফুঁসতে লাগল। লোকটা দাঁড়িপাল্লাটাল্লা বের করে কাগজ ওজন যেই শেষ করেছে, যুধিষ্ঠির আমার হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাঁড়িপাল্লা খামচে ধরে প্রচণ্ড জোরে চেঁচাতে লাগল, ভাবখানা এই, 'চালাকি পেয়েছ! আমি থাকতে এ বাড়িতে চুরি!'

হৈচৈ শুনে ছোটমামা দুই বন্ধু সমেত নেমে এল। তিনজনেই বলল, 'বেটা নির্ঘাত পাকা চোর।'

কাগজ টাগজ ফের ওজন করে দেখা গেল, ঠিক! লোকটা ওজনে বেদম ঠকাচ্ছিল।

ছোটমামা সেই প্রথম মাস্‌ল ফোলানোর সুযোগ পেল। জামার আস্তিন টাস্তিন গুটিয়ে শার্লক হোমসের মতন মুখ করে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমায় বলল, 'তোকে বলেছি না পানু অ্যালসেসিয়ান দূর থেকে চোরডাকাতের গন্ধ পায়। ঠিক চিনে বার করে। তবে অ্যালসেসিয়ান চেনা যার তার কম্মো নয়। মগজ লাগে। তা যাই হোক, এ বাড়িতে যুধিষ্ঠির থাকতে অন্তত চুরি ডাকাতির ভয় আর নেই।'

ছোটমামা, ছোটমামী আর দিদু, ছোটমামীর ভাইয়ের বিয়েতে দিব্যি সেজেগুজে নেমন্তন্ন গেল। আমার যাওয়া হল না। তিনদিন বাদে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। আমি শুখনো মুখে নিজের ঘরে গিয়ে পড়তে বসলাম। যুধিষ্ঠির রইল পাহারায়।

সবে দুটো পাতা উল্টেছি এমন সময় ক লিংবেল বেজে উঠল। এমনিদিন হলে দরজা খোলার প্রশ্নই উঠতো না, কিন্তু আজ যুধিষ্ঠির আছে। বুকে সাহস গজগজ করছে। বারান্দা দিয়ে উঁকি মারলাম। একটা লোক একা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা র‍্যাশন ব্যাগ। আমি এক লহমায় দেখে নিলাম লাঠি সড়কি বন্দুক টন্দুক সঙ্গে আছে কিনা। নাঃ, একদম একা দাঁড়িয়ে। যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে নীচে নেমে দরজা খুললাম। লোকটা একগাল হেসে আমাকে বলল, 'কি গো বাবুমশাই চিনতে পারছ? নাকি চিনতেই পারছ না। কোথেকে আসছি বলো তো? মাসির বাড়ি না পিসির বাড়ি? ভেবে বলবে কিন্তু!'

লোকটাকে হঠাৎ আমার চেনা মনে হল। বড়ো চেনা না। চেনার ছানা। যুধিষ্ঠির লোকটার গা শুঁকছে আর আহ্লাদি আহ্লাদি মুখ করে একমনে লেজ নাড়িয়ে চলেছে। যাক। লোকটা ডাকাত তো নয়ই চোর ছ্যাঁচোড়ও না। তাহলে যুধিষ্ঠির ওকে আস্ত রাখতো না।

আমি কপাল ঠুকে দেখলাম। ঝাঁ করে বলে দিলাম, 'তুমি আসছ সালকের ছোটমাসির বাড়ি থেকে।'

লোকটা অবাক হল। 'বাবাঃ! তোমার মনে আছে দেখছি। সেই কবে দেখেছ। তোমার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ ভালো। ঠিক ধরেছ।'

আমি তোমার ঘণ্টামামা, ছোটমাসির বাড়িতে থাকি। ছোটমাসি চিঠি দিয়েছে। দাঁড়াও আমি রিক্সাটা ছেড়ে দিয়ে আসি।'

লোকটা ফিরল মিনিট পাঁচেক পরে। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করে আমার আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে চলল, 'নাঃ। তোমাকে দিয়ে হবে না। বড়োদের কাউকে ডাকো।' আমি পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে বড়োরা কেউই বাড়ি নেই। এই 'তোমাকে দিয়ে হবে না'-টা শুনলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝড়ের মতন পড়ে ফেলে ভুরু কুঁচকে বললাম, 'এতে আমাকে দিয়ে না হবার কী আছে শুনি। লক্ষ্মী পুজোর জন্য বাসন কোসন আমি দেখে দিতে পারব না! তোমার কি তাই মনে হয়। আমার নাম প্রাণগোপাল মানে পানু।'

লোকটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'পারলে তো ভালই হত কিন্তু ভুল হলে আমিই বকুনী খাব। তোমার আর কি? আমি বরং কাল আসব—'

'আরে দেখোই না পারি কিনা।' তাকিয়ে দেখলাম আমার কথায় যুধিষ্ঠিরও বেশ খুশি। প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব হয়ে লেজ নাড়ছে।

লোকটা পকেট থেকে লিষ্টি বার করতে করতে বলল, 'আমার নাম ঘণ্টেশ্বর। লোকে ঘেঁটু বলে ডাকে। তা তুমি আমায় ঘণ্টামামা বলতে পারো। আমি তোমার ছোটমাসির মামাতো দেওর। লিস্টি মিলিয়ে বাসন নিয়ে যেতে হবে। বাসন টাসন ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। কাজটার একটা ছোট বাংলা নাম দিলে কেমন হয়। আমি একবার বাংলায় লেটার পেয়েছিলাম জানো। তারপরেই সব কেমন গুলিয়ে গেল।

কবিতা লিখতেও পারি আমি জানো— 'এই কাজটার নাম দেওয়া যাক 'পানু ঘেঁটুর ঘাঁটাঘাঁটি।'

আমি হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলাম। 'জব্বর নাম ঘণ্টামামা' যুধিষ্ঠির একটা 'ভুক' করে আমায় সমর্থন জানাল।

আমি ঘণ্টামামাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে দেখালাম রান্না, খাবার আর পুজোর ঘর পাশাপাশি। সবরকমের বাসনে ঠাসাঠাসি।'

ঘণ্টামামাকে বললাম, 'ঘাঁটাঘাঁটির জন্য বেশী হাঁটাহাঁটি করতে হবে না দেখেছ!'

ঘণ্টামামা অবাক হল, 'আরে দারুণ ছেলে তো তুমি। দারুণ বলেছ তো। তোমার নাম পানু না হয়ে সিংহেন্দ্রকেশর হওয়া উচিত ছিল। বাংলায় নির্ঘাৎ লেটার পাবে তুমি। একটু চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়র বানান আর দুর্ঘটনার সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে।'

আমি ঘণ্টামামার কথায় খুশি হয়ে লজ্জা পেয়ে কান চুলকে ফেললাম।

ঠাকুরঘর থেকে একটা বড়ো কাঁসার ঘট রেশন ব্যাগে ভরতে ভরতে ঘণ্টামামা বলল, 'ঘটটাই পুজোর আসল বাসন। তাইতো শাস্ত্রে বলে সর্বঘটে কাঁঠালী কলা। মাটির ঘট কিন্তু ব্যবহার করে না। মাটির ঘট থেকেই দুর্ঘটনা কথাটার জন্ম।

দুর্ঘটনা = দুম + ঘট + না—মানে দুম শব্দ হলেই ঘট আর নাই, অবশ্য সংস্কৃতে। মধ্যপদ লোপী দ্বিগু সন্ধি।'

আমি আর যুধিষ্ঠির ঘণ্টামামার জ্ঞানে মুগ্ধ হলাম।

ঘণ্টামামা নিজের মনে গুনগুন করে চলল। ছিরি কুলো বরণডালা। সবার জন্য লাগে থালা। দশটা থালা ব্যাগে ভরতে ভরতে ঘণ্টামামা বিরক্তমুখে বলল, 'আরো দুটো লাগবে যে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ একেকজনের তিনটে করে। বিশ্রী বাড়ি তো তোমাদের। মোটে থালা থাকে না। আমাকে আবার অন্য কোথাও থেকে দুটো জোগাড় করতে হবে।'

আমি ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম 'পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনব—' ঘণ্টামামা লোক ভালো। দয়ালু দয়ালু মুখ করে 'থাক অত খাটতে হবে না ' বলে প্রদীপ পিলসুজ ব্যাগের ভেতর চালান করে পঞ্চপ্রদীপের সন্ধান চাইল।

ভারি মুস্কিল। পঞ্চপ্রদীপের পাত্তা নেই। ঘণ্টামামা বলল, 'খোঁজ, ভালো করে খোঁজ। পঞ্চানন মানে পাঁচমুখো শিবকে তো চেনো না, সাংঘাতিক জিনিস। তাকে ওই পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করতে হয়। পঞ্চপ্রদীপ না পেলে তুমি বুঝবে ঠেলা। তোমায় ভূতে মারবে ঢেলা। শিব রেগে গিয়ে তোমার পেছনে ভূত তো ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদত্যি সব লেলিয়ে দিতে পারে, তখন বুঝবে!'

অনেক খুঁজে পঞ্চপ্রদীপ পাওয়া গেল ওপরের তাকে। পঞ্চপ্রদীপটা কোনওরকমে ঢুকলো ব্যাগে। ঘণ্টামামা যাচ্ছে তাই বকতে লাগল ছোটমাসিকে। 'তখনই বলেছিলাম একটা ব্যাগে আঁটবে না। একবার কানে তুলল না কথাটা। কিছুতেই শুনলো না।

এখন বোঝ ঠেলা। এই রইল তোমাদের বাসন কোসন আমি চললাম।' বলে ঘণ্টামামা রেশন ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। 'কাল তোমরা তোমাদের মতন করে বাসন পৌঁছে দিও—'

আমি ছোটমাসির হয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। আমাদের রেশন ব্যাগটা দিলাম অপরেশনের জন্য। একটু ঠাণ্ডা হল ঘণ্টামামা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার ভেতর কোষাকুষি চালান করতে করতে বলল, 'প্রচুর ঘষাঘষি হয়েছে। ঘুষোঘুষিও হয়ে থাকতে পারে। তোমাদের বাড়িতে কি ঠাকুরের সঙ্গে ঘুষি লড়ে!

আমি আশ্চর্য হলাম। 'ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে চালকলা ফলমূলের ফর্মূলার সঙ্গে ফুসমন্তরের নামে ঘুষ মন্তর দেয় ঠিকই, কিন্তু ঘুষোঘুষিও কী করে! কে জানে। দরজা তো বন্ধ থাকে.....।

আমাদের ঘণ্টা দেখে, খুব খুশি হল ঘণ্টামামা, 'বাঃ। এমন না হলে ঘণ্টা। আমি খুব ভালো ঘণ্টা নাচ জানি। শিখবে নাকি?'

আমি আর যুধিষ্ঠির ঘন্টা নাচ শিখতে উদগ্রীব হলাম।

দুহাতে দুখানা ঘণ্টা নিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে সত্যিই দারুণ নাচতে লাগল ঘণ্টামামা। টুং টাং আওয়াজের সঙ্গে পায়ের তাল মিলিয়ে মিঠে গান ধরল একখানা—

পানু ঘেঁটুর ঘাঁটাঘাঁটি
একটু শুধু হাঁটাহাঁটি
টুং টুং টাং টুং টুং টাং
ভুলায় সকল খাটাখাটি।

সুন্দর ঘণ্টানাচ। একটানা দুঘণ্টা দেখা যায়। কিন্তু দু মিনিট পরেই নাচ থামিয়ে দিল ঘণ্টামামা। 'আঃ। গায়ের খাটাখাটির সব ব্যথা মরে গেল এই দু মিনিটের নাচে।'

আমি একটু ঘণ্টা নাচটা প্র্যাকটিস করলাম। ঘণ্টামামা বলল, 'দারুণ হচ্ছে। পরের বার তোমাকে আরো ভালো করে শিখিয়ে দেবখন।'

ঘণ্টাগুলো ব্যাগে পুরেই একটা জিনিস দেখিয়ে ঘণ্টামামা শুধোল, 'ওটা কি পানি শঙ্খ?'

জিনিসটা আমি আগে কখনও খেয়াল করিনি। একটু দেখে বললাম, 'পানি শঙ্খ? রং আর সাইজ দেখে তো জাপানি শঙ্খ মনে হচ্ছে।'

'বেড়ে বলেছ। এঃ! তোমাদের পুষ্পপাত্র নেই। পুষ্প বাটিকা হলেও চলবে। আমি চারধারে তাকালাম, না ফুল রাখার কিচ্ছু নেই। হঠাৎ মনে পড়ল ছোটমামার ঘরে দুটো পেতলের ফুলদানীর কথা। পুষ্প বাটিকা না হোক পুষ্প ঘটিকা তো বটে। একটু খুঁজেপেতে নিয়ে এলাম। ফিরে দেখি প্রয়োজনীয় বাসনে দ্বিতীয় ব্যাগটা ভরে ফেলেছে ঘণ্টামামা। আমায় দেখে ভুরু কুঁচকে ধমকে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছ না দুটো ব্যাগই ভর্তি হয়ে গেছে। ওগুলো কিছুতেই নিতে পারব না বলে দিলাম। হঠাৎই 'ওমা' বলে চেঁচিয়ে উঠলো ঘণ্টামামা। 'দেখেছ—শির্‌নি মাখার গামলার কথা ভুলে মেরে দিয়েছি। তোমার ছোটমাসি আমাকে আস্ত রাখবে না।'

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করলাম, 'পুষ্প ঘটিকা তোমাকে নিতেই হবে। শেষে ছোট মাসি এমন রেগে যাবে। আমি গামছায় পুঁটলি বেধে দেব'খন।'

'আমার তো দুটো মাত্র হাত—নেব কি করে শুনি!'

তাও তো বটে, আমি একটু চিন্তায় পড়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকালাম। যুধিষ্ঠির এতক্ষণ লেজ নেড়েই চলেছিল আর মাঝে মধ্যে বাসন চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। যুধিষ্ঠির যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল। ভুক্ করে একটা আওয়াজ করে

মুখটা এগিয়ে দিল। আমারও মাথায় প্ল্যানটা এসে গেল। আমি বললাম, 'ঘণ্টামামা যুধিষ্ঠির পুঁটলিটা তোমায় মুখে করে বাস অবধি এগিয়ে দেবে'খন। আমি তো বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারব না। খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল ঘণ্টামামা। দু হাতে দুটো বাসন ভর্তি ব্যাগ। সত্যি যা ওজন । প্রায় নুয়ে পড়ছে ঘণ্টামামা। বিপত্তি বাধল শিরনি মাখার গামলা নিয়ে। মাথায় চড়ানো ছাড়া উপায় নেই। মাথার চেয়ে ঢের বড়। শিরস্ত্রাণের মতন গামলাটা মাথায় চড়াতে বাধ্য হল ঘণ্টামামা। থলে নামিয়ে গামলা উঠিয়ে রাস্তা দেখে নিতে হবে ঘণ্টামামাকে।

আমি যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিলাম। ঘণ্টামামাকে বাসে তুলে দিয়েই যেন ফিরে আসে। আর ঘণ্টামামাকে বলে দিলাম তাড়াতাড়ি বাসন ফেরত দেবার কথা।

ঘণ্টামামা রাস্তায় নেমে টাটা করল। হাতনাড়ার তো উপায় নেই। গামলা নেড়েই টা-টা জানাল ঘণ্টামামা। যুধিষ্ঠির পুঁটলি মুখে লেজ নাড়াতে নাড়াতে ঘণ্টামামার সঙ্গে চলল। আমি দরজা খুলে যুধিষ্ঠিরের ফেরার অপেক্ষায় রইলাম।

যুধিষ্ঠির আর ফেরেই না। যুধিষ্ঠিরের জন্য আমার ভাবনা শুরু হল। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে। বাসে ট্রামে আবার কাটা-টাটা পড়ল না তো!

ছোটমামার টাক দেখা দিল যুধিষ্ঠিরের টিকির আগে। 'কিরে দরজা হাট করে বসে আছিস যে?'

'বাঃ। যুধিষ্ঠির ফিরবে না—'

'যুধিষ্ঠির আবার কোথায় গেছে? বেড়াতে?'

'না না। কাজে গেছে। ঘণ্টামামাকে তুলতে।'

'ঘণ্টামামা আবার কে? কোথায় তুলবে?'

'আরে তোমার ছোটবোনের বাড়িতে থাকে! নিজের লোকেদের চেনো না!' ছোটমামা লজ্জিত হয়ে দিদুর দিকে তাকাল। 'ঘ দিয়ে নামের আরম্ভ ছোটনের বাড়িতে কে কে আছে গো মা—'

'ও বাবা ওদের বিরাট পরিবার, কতো লোক।' ভেবে ভেবে বলতে থাকে দিদু 'ঘনেন্দ্রনাথ, ঘড়ঘড়েপ্রসাদ, ঘনাঙ্কমোহন, ঘণ্টাকেশর —'

আমি বাধা দিলাম, 'ঘণ্টাকেশর না ওটা ঘণ্টাকাঁসর হবে। ওই নির্ঘাৎ ঘণ্টামামা।'

দিদু বলল, 'কিন্তু সে তো বহুকাল আগে চলে গেছে.....'

আমি বললাম, 'ঠিক তাই। যুধিষ্ঠির ওকে বাসে তুলে দিতে গেছে।'

'যুধিষ্ঠির ওকে বাসে তুলে দেবে কিরে?'

'বাঃ! ও একা কখনও অত বাসন নিয়ে যেতে পারে?'

'অত বাসন মানে?' এতো বড় হাঁ করল ছোটমামা।

ছোটমামী খিলখিল করে হেসে উঠল, 'বাসনের কি দুটো মানে হয় নাকি? সে হয় বেসনের। ডালের বেসন আর বিলাস বেসন।'

'আলবৎ হয়। বাসন মানে তৈজসপত্র' বলেই আকাশ পানে তাকিয়ে কিছুক্ষণের

জন্য কেমন স্থির হয়ে গেল ছোটমামা, তারপরেই চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। সব বাসন বোধ হয় নিয়ে গেছে।'

ছোটমামীও উত্তেজিত হল, 'বোধহয় টাও বোধহয় নিয়ে গেছে।'

ছোটমামা ছোটমামী আর দিদু মন দিয়ে সব ঘটনাগুলো শুনল। আমি একটু ঘণ্টা নাচ দেখাতে গেলাম। কেউই দেখতে রাজী হল না।

ছোটমামা মুখটাকে বুনো ওলের মতন করে আমার দিকে তেড়ে এল।

'তুই হতভাগা অচেনা লোক বাড়িতে ঢুকতে দিলি কেন?'

আমিও ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'বারে। তুমিই তো বলেছ যুধিষ্ঠির বাড়িতে থাকলে, দরজা খোলা পড়ে থাকলেও চোর, ছ্যাঁচোড়, গুণ্ডা, বদমাস সেঁধোনোর সাহস পাবে না। ঘণ্টামামা বাসন-কোসন ঠিক ফেরত দিয়ে যাবে দেখো। ও চোর ছ্যাঁচোড় হতেই পারে না। যুধিষ্ঠিরের ওর গায়ে পড়া আর লেজ নাড়া যদি দেখতে। তা ছাড়া ও তো ছোটমাসির চিঠি দেখাল।'

'ছোটমাসির চিঠি দেখাল' ভেঙচে উঠল ছোটমামা 'তলায় ইতি কী লেখা ছিল কী?'

আমারও রাগ ধরে গেল, 'যা থাকার তাই ছিল। ইতি তোমার ছোটমাসি লেখা ছিল। ছোটমাসির চিঠিতে কি ইতি তোমার মেজদাদু থাকবে?'

'উফঃ!' মাথায় হাত চেপে বসে পড়ল ছোটমামা 'ও হতভাগার পকেট হাতড়ালে নির্ঘাৎ অমন দশ বিশটা চিঠি মিলত। ছোটমাসি, মেজপিসে, বড় খুড়শ্বশুর, সোদপুরের সেজশালী সব্বার চিঠি। তোর ছোটমাসি আছে শুনে তোকে ছোটমাসিরটা দেখিয়েছে। একটা ব্যাপার কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যুধিষ্ঠিরটা অমন করছিল কেন? বেটা পাক্কা চোর।' আকাশপানে গাল পাড়ল ছোটমামা।

ছোটমামী ফুট কাটল, 'অ্যালসেসিয়ান যে—'

আমি শেষবারের মতন ছোটমামাকে বোঝাতে গেলাম. 'চোরফোর কি যা তা বলছ। কি বিশাল দাড়ি। ঠিক যেন ঋষিমশাই। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।'

'সেকি রে!!' লাফিয়ে উঠল ছোটমামা, 'মাথায় টাক? ডানগালে আঁচিল? কটা চোখ? ডোরাকাটা জামা?'

আমি মুগ্ধ হলাম, 'একদম তাই। তুমি কি হাতগোনা শিখছ নাকি?'

'আরে ওই হতভাগাই তো কুকুরটা বেচেছিল।'

'বাড়ি চিনল কী করে?'

'এইটুকু তো রাস্তা, নির্ঘাৎ পেছনে পেছনে এসেছিল।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সামনেই বাংলা পরীক্ষা। আমি ছোটমামাকে শুধোলাম. 'আচ্ছা ছোটমামা, কুকুরের রচনা থেকে 'কুকুর প্রভুভক্ত জীব' লাইনটা কি কেটে বাদ দিয়ে দেব?'

একটু উদাস গলায় ছোটমামা বলল, 'নাঃ। লালকালি দিয়ে ওটা আণ্ডারলাইন করে দিস।'

জলাতঙ্ক অথবা মায়ের কথা শুনলে

কন্ডাক্টরটা অতো মুসকো পানা না হলে গব্‌লা নির্ঘাত ওর কান ছিঁড়ে দিত। দাঁত ফেলে দিত। আরও অনেক কিছুই করে ছাড়তো। গব্‌লাকে তো আজ আমরা নতুন চিনছি না।

কন্ডাক্টরটা যখন মেজাজ দেখিয়ে বলল, 'বেশী না বকে নিজের সিটে গিয়ে বসো' তখন গব্‌লার মুখটা দেখার মতন হয়েছিল। চোখ লাল, মুখ থমথমে, আমরা ভাবলাম যাত্রার শুরুতেই বোধ হয় একটা মারপিট শুরু হল।

স্যান্ডো গেঞ্জী আর লুঙ্গী পরা কন্ডাক্টরের সর্বাঙ্গের ষণ্ডা-পানা ভাবটা ভালো করে দেখে আমি আর নিমাই গব্‌লাকে বললাম, 'ছেড়ে দে গব্‌লা। শুভকাজে ঝামেলা দিয়ে শুরু না করাই ভালো। হয়তো যাওয়াটাই ভেস্তে যাবে। লোকটা যা গোদা।'

এই আমরা প্রথম, একদম নিজে নিজে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। নিমের বড়মামা চাকরির সুবাদে ট্রান্সফার হয়ে দীঘায় আছেন তা বছরখানেক তো হবেই। সেই ইস্তক নিমাই আমাদের তাতাচ্ছে, 'চল না বড়মামার কাছে দীঘায় কদিন কাটিয়ে আসি।' এমনিতে আমাদের বাড়ি থেকে একা ছাড়তো না। কিন্তু নিমের মামার,

আমাদের রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবার চিঠি পেয়ে আমার আর গব্‌লার বাবারা তেমন আপত্তি করেনি।

সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বাসের টিকিট আগেই কাটা ছিল। এসপ্ল্যানেডে, বাসে উঠতে গিয়ে দেখি বাসটা ফুটপাত থেকে প্রায় ছ'হাত দূরে দাঁড় করিয়েছে। এই ছ'হাতের ভেতর অন্তত ছয় দুগুণে বারো ইঞ্চি জল দাঁড়িয়ে আছে। বাসটাকে ওরা অনায়াসে ফুটপাতের গায়ে লাগাতে পারত, তাতে যাত্রীদের উঠতে অনেক সুবিধে হত। বেশির ভাগ যাত্রীই ছপাৎ ছপাৎ করে বাসে উঠল। নিমে একটু চড়া গলায় প্রতিবাদ করেছিল, 'বাসটা ফুটপাতের গায়ে এনে লাগান না, তাহলে সকলের কতো সুবিধে হয়।'

কন্ডাক্টরটা নিমেকে একটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে বিশ্রী অভদ্র গলায় তেড়ে উঠল, 'বেশী বাজে না বকে নিজের জায়গায় গিয়ে বসো খোকা।' নিমেটা আরেকটু হলেই কাদায় পড়ে যেত, কোনও রকমে সামলে নিল। বেচারার ডান পা-টা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। ছুটতে হল টিউবওয়েলে, পা ধুতে।

পা ধুয়ে ফিরে এসে দেখি বাসের সামনে বিশাল হট্টগোল। কন্ডাক্টর এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে বাসে ওঠার সময় এমন ঠেলে দিয়েছে যে তিনি পায়ে বেশ চোট পেয়েছেন। ভদ্রমহিলা একাই যাবেন বাসে। দীঘায় ছেলের কাছে।যারা ওঁকে বাসে তুলতে এসেছিল তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লোক এসে গেছে কন্ডাক্টরদের দলের। কন্ডাক্টরটা ভদ্রমহিলা চোট পাওয়াতে কোথায় লজ্জা পাবে, না তারস্বরে চিৎকার করছে। 'অত যদি অসুবিধে হয় তো এই বাসে যাবেন না।'

ওঁর সঙ্গের লোকেরা বলছে, 'তবে টিকিটের পয়সা ফেরত দাও।'

'টিকিট একবার কাটা হয়ে গেলে পয়সা ফেরত দেওয়া হয় না,' বলল কন্ডাক্টরের দলের ক'টা লোক। বৃদ্ধা বললেন, 'ছেড়ে দে কম্‌লা ঝগড়া করে কী হবে। আমার তেমন কিছু লাগেনি।'

আমাদের কিন্তু গা চড়চড় করে উঠল। ছিঃ! বুড়ো মানুষের সঙ্গে এমন করে। আমরা সিটে গিয়ে বসলাম। গব্‌লা তো সিটে বসে থেকে রাগে গরগর করে চলেছে। আমাদেরও রাগে গা জ্বলছে।

আমাদের ভেতর নিমাইই বেশ চৌকশ। বলল, 'মালটালগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নে।' মাল মোট পাঁচটা। আমার আর নিমাইয়ের এটাচি দুটো সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম। গব্‌লার কিট্‌ ব্যাগ আর আমার ওয়াটার বটল তুলে দিলাম মাথার ওপর মাল রাখার তাকে। গবলা একটু হাসল। 'চারদিকে জল থৈথৈ করছে, তার ভেতর তুই ওয়াটার বটল এনেছিস। জানলা দিয়ে জিভ বাড়ালেই তো বৃষ্টির জল খেতে পেতিস।'

আমি একটু লজ্জা পেলাম, 'মা কিছুতেই ছাড়ল না। বলল, ওটা নিয়ে যা। ঠিক কাজে লাগবে। কোথায় কী জল খাবি, অসুখ করবে।'

গব্‌লার রাগ পড়েনি। বলল, 'কন্ডাক্টরটাকে শিক্ষা না দেওয়া অবধি......................'

নিমে বলল, 'ধম্মের কল বাতাসে নড়ে, দেখবি ঠিক টের পাবে বাছাধন।'

আমি বললাম, 'বোকার মতন কথা বলিস না। বাসের সব জানলা বন্ধ। বাতাস একটুও নেই। ধম্মের কল নড়বে কী করে? টেরটা বাসের লোকেদেরই পাওয়াতে হবে।'

আমার লজিকে নিমে আপত্তি তুলতে পারল না।

বাস্ ছাড়ল ঠিক সময়ে। চারপাশে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। হাওড়ার জ্যাম পেরোতেই জন্ম কাবার। তারপর বাসটা একটু স্পীড্ নিল।

নিমাইয়ের একটু কাব্যচর্চার অসুখ আছে। নিমাই সঙ্গে করে কবিতা লেখার খাতাটাতা নিয়ে এসেছে।

নিমে আমাদের বহুবার বলেছে—উন্মুক্ত ধানক্ষেত, এদিক সেদিক খাল বিল, মাঝে মাঝে বক কিংবা হাঁসের সারি উড়ে যাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের বুকে মেঘেদের সঙ্গে সূর্য চোর চোর খেলছে। এমন সিন পেলে নাকি অন্তরের কবিতাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কবিতারা গলগলিয়ে কলের জলের মতন বেরিয়ে পড়ে। এর ওপর এক ফালি বাঁকা চাঁদ আর রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে জুটলে তো কথাই নেই।

নিমে যুদ্ধের আগের মুহূর্তে সৈনিকেরা যেমন বন্দুক বাগিয়ে ধরে তেমন করে কলম খাতা বাগিয়ে ধরে জানলার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কবিতার কলকলানির আশায়। আমি নিমের পাশে বসে একবার জানলার বাইরে, একবার নিমের খাতার দিকে আরেকবার নিমের মুখের দিকে তাকালাম। বাইরে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। নিমের মুখটা কন্ডাক্টরের ব্যবহারে একটা পোড়া হাঁড়ির মতন। নিমে তাঁর ভেতরেও ছবি আঁকছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বৃষ্টির ছবি আঁকছিস? না নারকোল গাছ?'

নিমে খেঁকিয়ে উঠল, 'হাতের লেখাটা বাসের ঝাঁকানিতে অমন দেখাচ্ছে।'

আমি ভালো করে মন দিয়ে তাকালাম। কষ্ট করে পড়া যাচ্ছে। নিমে লিখেছে,

"কন্ডাক্টর বড়ো ট্যাটা
তার সাথে বৃষ্টির ঘনঘটা"

আমি বললাম, 'নিমাই চন্দর ছন্দপতন হচ্ছে যে।'

নিমাই বলল, 'তা কি আর আমি বুঝছি না। তাই ত লেখা বন্ধ করে বাইরে তাকিয়ে ভাবছি।'

আমি বললাম, 'বরং করে দে না, 'তার সাথে বৃষ্টির ঝ্যাঁটা।'

'গবেটের মতন কথা বলিস না। যা হয় তা হয় একটা লিখলেই হল। 'বৃষ্টির ঝ্যাঁটার' কোনও মানেই হয় না।'

আমি বললাম, 'আলবৎ হয়। বৃষ্টির ছাট আঁকতে গেলে ঝ্যাঁটার কাঠির মতই আঁকতে হয়। তা ছাড়া বৃষ্টিই তো ঝেঁটিয়ে সব ময়লা সাফ করে।'

বৃষ্টির সাফাই সম্বন্ধে আমার সাফাই উড়িয়ে দিতে পারে না নিমাই। একটু ভাবে। 'বলছিস? তাহলে তাই লেখা যাক।'

'কন্ডাক্টর বড়ো ট্যাটা

তার সাথে বৃষ্টির ঝ্যাটা'

পরের লাইনটা ভাবাই ছিল নিমের —

'মনটা যে কোণঠাসা'

আমি যুগিয়ে দিই —

'নেই কবিতার আশা—'

নিমে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। 'এটা কেমন হল—'

'ঠিকই তো হল। মানে কবিতা হচ্ছে কিন্তু ভালো কবিতার আশা নেই।'

'মানে?'

'আরে বাবা মনের ভাব প্রকাশ মানেই তো কবিতা। সেটা ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু এইরকম বদখৎ মেজাজে কি ভালো কবিতা বেরোয়? তুই-ই বল না। অর্থাৎ হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না।'

'পাঠকে বুঝবে?'

'আরে সব যদি বুঝিয়েই দিস তো পাঠক হতভাগা কী করবে? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে। তোকে নিয়ে মাথাও ঘামাবে না। কিন্তু ওই একটু বোঝা না-বোঝার বোঝা মাথায় চাপলে পাঠক পাঁঠক বনে যাবে। নাওয়া খাওয়া ফেলে তোকে মাথায় চাপিয়ে দিনরাত ভেবে মরবে। হাজারটা মানে করে রাতারাতি তোর নাম করে দেবে। তুই নিজে, আদপে বুঝেছিস কিনা সে প্রশ্ন মোটে তুলবেই না।'

কথাগুলো মনে হল নিমের পছন্দ হয়েছে। লাইনটা লিখে নিয়ে বলল,

'কিন্তু এবার কী হবে?'

'এবারে তো যা খুশি তাই লিখতে পারিস। বলেই তো দেওয়া হল যে কবিতার আশা নেই। কেন আশা নেই আগেই বলেছিস। কতক্ষণ আশা নেই সেটা এবার লিখে ফেললেই হল।'

'আশা ততক্ষণ নেই যতক্ষণ না কন্ডাক্টরটা শায়েস্তা হয়।'

'হ্যাঁ এরকম একটা লাইন এখন অনায়াসে লিখে ফেলতে পারিস।'

'যদি না বানাই তারে পাঁঠা'

'যদি না লাগাই তারে চাঁটা'

'সাজা দেব দশ দিন হাঁটা'

'ফুটুক গলায় মাছোকাঁটা'

'মার খেলে শেষ হয় ল্যাটা'

নিমাই আপত্তি করল, 'মাছের কাঁটাকে মেলানোর জন্যে কী মাছোকাঁটা বললে ফাউল হবে না?'

আমি বললাম, 'কবিতায় ওগুলো অ্যালাউড। ভেবে দেখ কোনটা পছন্দ।'

নিমাই বলল, 'প্রথম লাইনটাই ভালো—'

'পড় তাহলে, সব মিলিয়ে কি দাঁড়ালো।'

'কণ্ডাক্টর বড়ো ট্যাটা।

'তার সাথে বৃষ্টির ঝ্যাঁটা'

'মনটা যে কোণঠাসা'

'নেই কবিতার আশা'

যদি না বানাই তারে পাঁঠা।'

নিমে বেশ ক'বার কবিতাটা পড়ে আমায় বলল, 'তোর বেশ ছন্দজ্ঞান, লিখিস না কেন রে?'

আমি বললাম, 'ওসব আমার আসে না।'

উলুবেড়িয়া বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়েছি, তখন কাব্যচর্চায় ছেদ পড়ল। আমাদের দুটো সিট আগে বসা এক চিমসে মার্কা ভদ্রমহিলা সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ হাত পা নেড়ে কী সব বলতে শুরু করলেন। আমরা প্রথমে ভাবলাম ভদ্রমহিলার মৃগি আছে। গব্‌লা অনেক খবর রাখে, ও বলল যে পুরোনো নিউমোনিয়ার রুগীও

এমন করে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে কন্ডাক্টর এগিয়ে এলো। বোঝা গেল মহিলার গায়ে জল পড়ছে ওপর থেকে। কন্ডাক্টরটা যথারীতি গম্ভীর চালে বলল, 'বাইরে অতো বৃষ্টি হলে এমন একটু আধটু পড়ে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা ততো সহজ হল না। ভদ্রমহিলা একাই চ্যাঁচাচ্ছিলেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মতনই কন্ডাক্টরও জানতো না যে ওঁর সঙ্গে রয়েছেন ওর তিন বোন, তাঁদের চার স্বামী আর তাদের তিন শালী।

'ওরকম একটু পড়ে' শুনে তারা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। 'ওরকম তোমার মামাবাড়িতে পড়ুক; এটা তোমার মামাবাড়ি নয়। আমরা পুরো ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি। বাস থামিয়ে তোমার ছাত সারাও। নয় তো....... আমরা বাসের গিয়ার খুলে নেব।.....আর সেই সঙ্গে তোমার আর ড্রাইভারের দাঁত, জুড়ে দিল আরেকজন। আটজনের হুংকারে কন্ডাক্টরটা কেমন থতমত খেয়ে গেল. ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি সাইড করতে।

ওই মুষলধারে বৃষ্টির ভেতর কন্ডাক্টর একটা তেরপল নিয়ে উঠলো বাসের ছাদে।

আমি মাঝখানে। নিমে আমার ডানদিকে, বাসের জানলা ঘেঁষে, আর গব্‌লা আমার বাঁ পাশে। আমি গব্‌লাকে বললাম, 'গব্‌লা বড়ো জলতেষ্টা পেয়েছে রে, আমার জলের বোতলটা একটু দিবি রে?'

গব্‌লা উদগ্রীব হয়ে কন্ডাক্টরের হেনস্তাটা উপভোগ করছিল, ওয়াটার বটলটা দিতে দিতে চটে উঠল, 'লোকে জল এড়াতে হিমসিম আর তোকে এখনই জল খেতে হবে। জানলা দিয়ে জিভ বাড়িয়ে বৃষ্টির জল খা না।'

সক্কলে একমনে জানলা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে বাইরে তাকিয়ে কন্ডাক্টরের তেরপল খাটানো দেখার চেষ্টা করছে, পেছনের সিটে বসা একজন বিশাল চেহারার লোক, পালোয়ান টালোয়ান হবে, জলে ভেজা ভদ্রমহিলার পাশে এসে পরিবেশ নিরীক্ষণ করে ঝাল ঝাড়ল, 'বাসটা ফুটো, কন্ডাক্টরটা শুধু অভদ্র নয়, বুদ্ধু আর বেকুব। আমার গায়ে জল পড়লে ওর চামড়া দিয়ে ওয়াটার প্রুফ বানাতাম। এদের শিক্ষা হওয়া দরকার। আমরা কি পয়সা কিছু কম দিয়েছি?'

কন্ডাক্টরটা অভদ্র হতে পারে, কিন্তু কাজের লোক। দিব্যি তেরপল দিয়ে জল আটকানোর ব্যবস্থা করে দিল।

ভিজে চুপচুপে কন্ডাক্টরটাকে দেখে গব্‌লার আর আমাদের রাগ খানিক পড়ে এল। গব্‌লা বলল, 'ঠিক হয়েছে বেটার।'

একটু পরে বাস থামল মেচেদায়। এতো ভালো বেগুনী আমি আগে খাইনি। দামটা একটু বেশী বটে, কিন্তু জিভে লেগে থাকে।। ভাবাই যায় না যে বেগুনে শুধু একটা দীর্ঘ ই-কার জুড়ে দিলে এতো ভালো খেতে হতে পারে।

বৃষ্টিটা কিন্তু অনর্গল পড়েই চলেছে। আমি গব্‌লাকে বললাম, নিমে আমাকে জানলার ধারে বসতে দেবে না। ও বৃষ্টির ওপরেই কী একটা লেখার চেষ্টায় আছে। দেখে দেখে টুকলী করবে। তুই আমাকে অন্তত প্যাসেঞ্জের পাশে বসতে দে। গব্‌লার

মেজাজটা কন্ডাক্টরের হেনস্তা আর বেগুনীতে বেশ নরম। আমি আর গব্‌লা সিট পাল্টালাম। বাস ছেড়ে দিল।

বাজকুল, হেড়িয়া পেরিয়ে যখন আমরা কাঁথীর কাছাকাছি তখনই হঠাৎ পেছন থেকে সেই পালোয়ানমার্কা লোকটা বাজখাঁই হাঁক পাড়ল 'কন্ডাক্টর।'

কন্ডাক্টর সবাইকে ছাড়িয়ে প্রথম সিট থেকে শেষ সিট অবধি এগিয়ে গেল। মুখটা একটু কাঁচুমাচু।

'কী হচ্ছেটা কি! ফুটো বাস দিয়ে লোক ঠকাচ্ছ? গত কুড়ি মিনিট মাথায় জল পড়ছে, ভাবছিলাম কিছু বলব না, কাঁথী পৌঁছে যাব কিন্তু অসম্ভব, এতক্ষণ বেপাড়া ছিল বলে কিছু বলিনি। জানো আমি কে?'

কন্ডাক্টর মাথা চুলকোলো।

'আমিই কাঁথীর বেচুদা। বলেই বেচুদা কন্ডাক্টরের কলার একহাতে আর কান এক হাতে টেনে ধরল। জানো রাজনৈতিক পলিটিসিয়ানরা পর্যন্ত আমার কথায় ওঠে বসে। খবরদার। এমন ফুটো বাসে যাত্রী তুলে ঠকালে রুটে বাস চালানো বন্ধ করে দেবো।'

কন্ডাক্টর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, বেচুদা থামিয়ে দিল। 'বেশী ক্যাঁচর ক্যাঁচর করলে কাঁথীতে নামিয়ে কাঁথা পরিয়ে ছেড়ে দেব, বুঝলে! তখন কাত মেরে কোঁতাতে হবে। আমার নাম কেন বেচুদা সেটা ভালো করে জানতে চাও?'

কন্ডাক্টরের মুখটা সত্যি দেখার মতন হল। কোথায় সকালের তেজ আর দেমাক। কেঁচো খাওয়া ছুঁচো মুখ। বেচুদার নাম ভালো করে জানার তেমন একটা আগ্রহ নেই।

মিনিট দুয়েক বাদে বাস কাঁথী সহরে ঢুকে দাঁড়াল। বাইরে একটা বিরাট জনতা মালাটালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কন্ডাক্টরের কান ধরে বাসের প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বেচুদা বলল, আমি কাঁথীতে নেমে যাচ্ছি। দীঘা পৌঁছোনোর আগে কারুর গায়ে জল পড়লে বা অন্য অসুবিধে হলে আমায় জানাবেন। বাসের নম্বরটা নোট করে রাখছি আমি। এই হতভাগাটাকে দেখব। আমার ঠিকানা 'কাঁথীশ্রী বেচু পাল, কাঁথী'।

প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় আমি কন্ডাক্টরকে একটা কাচির ওপর ল্যাং মারলাম। কানটা অন্য লোকের হাতে ধরিয়ে রাখার সুবিধে আছে। কন্ডাক্টর হুমড়ি খেল কিন্তু পড়ল না। বাসের ভেতর একটা মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল, 'এবারের মতন ছেড়ে দাও বাবা। ও আর করবে না।' আমরা তাকিয়ে দেখলাম সকালের সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা।

বেচুদা বলল, 'আপনাকেই আজ সকালে ও ঠেলে দিয়েছিল না মাসিমা।'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা হোক। ও আমার ছেলের চেয়েও ছোট, ওর কি বুদ্ধি হয়েছে বাবা।'

বেচুদা, কন্ডাক্টর আর আমরা সকলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

বেচুদা কাঁথীতে নেমে গেল। সমবেত জনতা 'বেচুদা যুগ যুগ জিও' রবে ফেটে পড়ল।

কাঁথীতে বাস দাঁড়ায় দশ মিনিটের ওপর। বেগুনী খেলে বড় জল তেষ্টা পায়। জল খেতে গিয়ে দেখি ওয়াটার বট্‌লটা বিলকুল ফাঁকা।

সকালবেলা মা যখন বলল, 'ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে যা পানু, কাজে দেবে।' আমি তখনই বলেছিলাম, 'যা ছিরির ওয়াটার বট্‌ল! যেমন ভাবেই রাখো জল পড়বেই ওটার থেকে।' কিন্তু মায়ের কথা শুনলে ভালো হতে বাধ্য ওয়াটার বটলটা ঠি......ক কাজে লেগেছে।

সেই চিমসে পানা ভদ্রমহিলার গায়ে জল তো বাসের ছাদ থেকে পড়েনি, পড়েছিল আমার ওয়াটার বটলটা থেকে।

বাস মেছেদা ছাড়ার আগে কাঁথীশ্রী বেচুদার পরিচয় পেয়ে ওয়াটার বট্‌লটা তুলে দিয়েছিলাম বেচুদার মাথার ওপরের তাকে। অনেক মালের ভিড়ে। বেচুদার মাথার জলও কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি বাইরের নয়। সেই আমার ওয়াটার বট্‌লের। বট্‌লটা পুরো ফাঁকা। আগে জল খাইনি খাবার ভান করেছিলাম মাত্র। পাছে বেচুদার মাথায় পড়ার মতন জল আর না থাকে! যদি বট্‌ল আগেই ফাঁকা হয়ে যায়।

বাবাঃ! বেগুনী খেলে যা জলতেষ্টা পায়।

কাঁথীতে জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচল।

সেজমামার ঘুষি

মেজমাসি যদি ঠিক সময় মতন ধরে না ফেলতো, তাহলে ছোড়দাটার নির্ঘাৎ টাক পড়ে যেত।

মেজমাসির ধরনটা অন্য মাসিদের থেকে একদম আলাদা। খুব রাশভারি। চোখে মোটা কাঁচের চশমা, মাথার চূড়োয় ডিমে খোঁপা। দেখলেই ভয় করে। সেইজন্যেই বোধ হয় মেজমেসোর সদাই শুকনো ঝিঙের মতন মুখ থেকে থেকেই কান চুলকে ফেলে।

মেজমাসি যেদিন মামাবাড়িতে আসে সেদিনই মামাবাড়ির সকলের খুঁৎগুলো ধরা পড়ে। ভুল শুধরোনোর গম্ভীর উপদেশ দিয়ে তবে মেজমাসি ফিরে শ্বশুরবাড়ি।

মেজমাসি সেজমামার কাছে গিয়ে বেশ কড়া গলায় বলল, 'তুই কী মনে করেছিসটা কী হাবু? গাঁট্টা খেয়ে খেয়ে বিল্টেটার যে টাক পড়ে যাবার দাখিল।'

মেজমাসির কথায় সকলে নজর করে দেখল, মিথ্যে বলেনি মেজমাসি। ছোড়দার খোঁচা খোঁচা কদম ছাঁটওলা মাথায়, চুলের থেকে শাঁস যেন অনেক বেশী দেখাচ্ছে।

সেজমামা বলল, 'আমি কি ওকে গাঁট্টা খেতে বলেছি নাকি? ও নিজেই তো আগবাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পয়সার লোভে। গাঁট্টা পিছু দশ পয়সা করে পেয়ে পেয়ে ও যে বড়লোক হতে চলল সে খোঁজ রাখো?'

মেজমাসি বলল, 'ওটার কি বুদ্ধি হয়েছে? তুই একটা গরিব, টেকো লোক ধরে আন না। তারও দুটো পয়সা হয় আর টাকপড়ার ভয়ও থাকে না।'

সেজমামা বিরাট চাকরি করে, কোট টাই পরে বেরোতে হয়। রোজ গাড়ি এসে তুলে নেয় বাড়ি থেকে। সেজমামা এমনিতে দারুণ আড্ডাবাজ লোক। সন্ধের পর থেকে রাত্তির অবধি ঘরময় বন্ধুবান্ধব গিজ্‌গিজ্ করে, আর হাসি ঠাট্টায় মামাবাড়ি গমগম করে। কিন্তু সেজমামার এই এক উদ্ভট খেয়াল। সারা দিনে অন্তত পঞ্চাশটা গাঁট্টা কারু না কারুর মাথায় বসাতেই হবে, না হলে রাতে ঘুম হবে না। রাতভোর পায়চারি করে কাটাবে দালানে।

আমরা প্রথমটা জানতাম না যে মামাবাড়ির কাজের লোক ভজুয়া, টাকার লোভে গাঁট্টা খায়। কিন্তু সত্যি কি আর চাপা থাকে?

ভজুয়া একদিন সাত সকালবেলা আলুথালু বেশে বড়মামার পায়ে ঢিপ্ করে প্রণাম করে বলল, 'আমি দেশে চললাম বড়বাবু, হামার পোষাচ্ছে না।'

বড়মামা রাজনীতির মাতব্বর গোছের লোক, ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বড়োমামা শুধোল, 'ভজুয়া, তোর মাথার আলুগুলো এত বড় হল কী করে?'

ভজুয়া ডুকরে উঠল। 'বড়বাবু.....উঁ.........হুঁ।—হুঁ।'

রোজ ঢিপ ঢাপ প্রণাম খেতে খেতে, বড়মামার পায়ের, মানুষের মাথা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে। বড়মামা চোখ বুজে বলতে পারে, ঢিপ করে যে প্রণাম করল তার মাথায় গোবর, আলু না অন্য কিছু।

'এখানে চাকরি করলে আর দেশে ফিরতে **পারব** না বাবু। আমাদের দেশে মাথায় আলু ভীষণ অলুক্ষুণে। মেয়ের হয়তো বিয়েই হবে না।'

বড়মামা বুঝল মাথার আলুর জন্যেই ভজুয়া আলুথালু। 'তা হলটা কি করে?'

'সেজবাবুর গাঁট্টা খেয়ে। আগে ছিল আস্তে, কিন্তু এখন খুব জোরে মারে।'

বড়মামা কাগজ নামিয়ে বাজখাঁই স্বরে ডাকল, 'হাবু'।

সেজমামা কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়াতেই জানা গেল যে ভজুয়া গত তিন বছর যাবৎ মাসিক কুড়ি টাকার লোভে সেজমামার গাঁট্টা হজম করছে।

বড়মামা সব শুনে নির্দেশ দিল, 'তুমি এসব বন্ধ করো। ও চলে গেলে—'

সেজমামা বলল, 'ভজুয়া গাঁট্টা কিন্তু টাকা নিয়ে খায়। গাঁট্টা খাবার কাউকে না পেলে আমার ঘুম হয় না। সারারাত জেগে পায়চারি করি। পরদিন, অফিসে পর্যন্ত ঘুমোতে পারি না।'

বড়মামা এক্কেবারে কড়া হাকিম। 'দু রাত্তির পায়চারি করে দেখো, তৃতীয় রাতে ঘুম আসে কিনা।'

দাদার প্রতি সেজমামার শ্রদ্ধাটা সত্যিই দেখার মতন। কাউকে গাঁট্টা না মেরে দু-দুটো রাত সেজমামা স্রেফ পায়চারি করে কাটিয়ে দিল। চারদিনের দিন সকালবেলা সেজমামার ঘরের সামনে দেখা গেল একটা ঝোলানো বিজ্ঞাপন।

'মাথায় গাঁট্টা খাইবার লোক খুঁজিতেছি। গাঁট্টা পিছু নগদ দশ পয়সা। হাতে নাতে টাকা। শীঘ্র আসুন।'

অন্য সময়ে হলে বড়মামা নির্ঘাৎ আপত্তি তুলত কিন্তু সেজমামার গত ক'রাতের করুণ পায়চারি তার চোখ এড়ায়নি। তাই কিছু বলল না।

একেকজন মানুষের জীবনের ambition একেকরকম। তাই নিয়ে স্কুলে বছর বছর essay লিখতে হয়। আমার ambition বড় গায়ক হবার। আমি গানের স্কুলে ভর্তি হয়েছি। রোজ যখন পারি যতক্ষণ পারি গলা সাধি। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমার অ্যামবিশনে বাবা খুব খুশি। ছ'মাসের ভেতর ভাড়াটেরা কেটে পড়েছে। পনেরো বছর কেস করেও বাবা ওদের তুলতে পারেনি।

ছোড়দার অ্যামবিশন বড়লোক হওয়ার। এই বড়লোক হবার অ্যামবিশন নিয়ে ছোড়দাই প্রথম পড়ল সেজমামার বিজ্ঞাপনের খপ্পরে। কথায় বলে, যার যেমন কপাল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যার যেমন মাথাও বলা যায়।

রোজ সেজমামা অফিসে বেরোনোর আগে ছোড়দা টুক্ করে সেঁধিয়ে পড়ে সেজমামার ঘরে। তারপর মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে আসে। মামাবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে ফিরতে চায় না মোটে। মামাবাড়িতে থাকবার অবশ্য আমাদের অবাধ স্বাধীনতা। ছোড়দা, ক'টা গাঁট্টা খেল আর তার জন্যে কতো পেল তা কিন্তু আমাদের তো বলে না, ছোড়দার প্রাণের বন্ধু নন্দদাকেও বলে না।

আমিই শুধু খেয়াল করেছিলাম যে ছোড়দার মাথার ধাঁচটা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। মাথার চুল কমে ভেতর দিয়ে শাঁস দেখা দিচ্ছে। শুধু বেড়ে যাচ্ছে ছোড়দার রাতে শুতে যাবার আগে টাকা গোনার বহর।

সেবার বিশ্বকর্মা পুজোর আগে আমার ঘুড়ি কেনার টাকায় টান ধরল। সক্কাল বেলা সেঁধিয়ে পড়লাম সেজমামার ঘরে। আমার দরকার ছিল মোটে চার টাকা। মানে চল্লিশটা গাঁট্টা। চার টাকা হাতে নিয়ে সেজমামার ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। বুঝতে পারলাম কেন ছোড়দার অমন সুন্দর ঝুনো নারকেলের মতন মাথাটা আস্তে আস্তে পটলের মতন দেখতে হয়ে উঠছে। বাবা ঃ। গাঁট্টা তো নয় যেন মাথায় একেকটা বেল এসে পড়ছে গাছ থেকে। মেজমাসি খেয়াল

করে সেজমামাকে বলার আগে থেকেই আমি বুঝেছিলাম যে কিছু একটা করা দরকার।

মেজমাসি, সেজমামাকে বকুনি দিয়ে চলে যাবার পর দিন সকালেও দেখি ছোড়দা সেজমামার ঘর থেকে গুটি গুটি বেরোচ্ছে।

ছোট মাসিটা আমাদের চেয়ে একটুখানি বড়ো, একরকম আমাদের বন্ধুই। আমি সেজদা আর ছোটমাসি উঁকি মেরে দেখছিলাম ছোড়দার রকমটা। ছোটমাসি বলল 'হুঁ হুঁ বাবা, টাকার নেশা বড় নেশা। ও নেশা একবার ধরলে ছাড়া ভারি শক্ত।'

সেজদাটা বড়রা না থাকলে তেমন বেশী তোতলায় না। বলল, 'রোজ সক্কালবেলা ওটাকে চে.........চ্—চেপে ধরে রাখব দ্‌দেখি কী করে?'

আমি বল্‌লাম, 'তুমি কদ্দিন ধরে রাখবে সেজদা? এটা গায়ের জোরের কাজ মোটেই না। বেদে বলেছে, বুদ্ধির চয্য, ফলং শস্য অর্থাৎ বুদ্ধির চাষ করলেই শস্য ফলে। 'এটা বুদ্ধি দিয়ে হাসিল করার কাজ।'

ছোটমাসি বলল, 'পেনো ঠিকই বলেছে। plan মাফিক কাজ করতে হবে। প্রথমেই জানতে হবে, সেজদা কেন এমনটা করে আর কীভাবে এটা বন্ধ হবে।'

'গ্‌-গৌর মামার বাড়ি চল। এক্ষুণি সব বলে দেবে।'

ঠিক বলেছে সেজদা। মাঝে মধ্যেই এমনটা বলে ফেলে। গৌরমামা হল সেজমামার ভীষণ বন্ধু। একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। একে ডাক্তার তার ওপর আজেবাজে প্রচুর পড়াশোনা করে। গৌরমামা অবশ্য বেশির ভাগ দিনই সন্ধেবেলা মামাবাড়িতে সেজমামার ঘরেই আড্ডা দেয়. কিন্তু সেজমামার সামনে তো আর এসব জিজ্ঞেস করা যাবে না। আমরা তক্ষুণি দৌড় লাগালাম গৌরমামার বাড়িতে। দেরি হলে আবার চেম্বারে বেরিয়ে যাবে।

গৌরমামা সকালের জলখাবার খেয়ে অভ্যেস মতন খড়কে দিয়ে কান খুঁচোচ্ছিল, আর থেকে থেকে একটা গানের লাইন ভাঁজছিল। আমাদের দেখে খুব খুশী হয়ে বসতে বলল। আমরা সত্যি আশ্চর্য হলাম শুনে, যে গৌরমামা কিন্তু সেজমামার গাঁট্টার কথা মোটে জানেই না। মানে সেজমামা বা অন্য কেউ কিছু বলেইনি।

সব শুনে গৌরমামা বেশ গম্ভীর মুখে পায়চারী করতে করতে বলল, 'ঝামেলিয়াস কেস।'

গৌরমামার ঘরময় ঠাসা বইপত্তর। শেলফ থেকে এই মোটা কি একটা বই টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ উল্টে পাল্টে বলল, 'হু'।

ছোটমাসি শুধোল, 'কুঁ?'

গৌরমামা পাল্টা প্রশ্ন করল, এমনটা কদ্দিন করছে হাবু? আমরা বললাম, 'তা ভজুয়াকে ধরলে বছর সাড়ে তিন হবে।' গৌরমামা বলল, 'হুঁ বোঝা গেল।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বোঝা গেল?'

'ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তোদের সেজমামা মানে হাবু একসময় প্রচুর বক্সিং, জুডো ক্যারাটে ফ্যারাটে শিখেছিল তা তোরা জানিস নিশ্চয়ই।

আমরা সম্মতি জানালাম।

'বছর সাড়ে তিন আগে, হাবুর সঙ্গে একটা লোকের বাসে ঝগড়া হয়। তারপর হাবু লোকটাকে বাস থেকে মারবে বলে টেনে নামায় মানিকতলার মোড়ে। লোকটা যদি বক্সিং, জুডো, ক্যারাটের একটাও জানতো তাহলে হাবু ওকে ঠেঙিয়ে ফ্ল্যাট মানে পাট করে দিত। কিন্তু লোকটা নেহাৎ আনাড়ি। হাবু জুডো ঝাড়ল, লোকটা হাবুর পেটে মাথা দিয়ে মারল এক টুঁ। হাবু ক্যারাটে চালাল পা তুলে, লোকটা হাবুকে দিল কাতুকুতু। হাবু মরিয়া হয়ে বক্সিং চালাল, লোকটা হাবুকে এক মোক্ষম ল্যাং মেরে চিত করে ফেলে দিল। চার পাশের লোক হোহো করে হেসে উঠল। আমাদের বিশু ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে হাবুকে চিতপাত দেখে, তুলে ধরে ঝেড়েঝুড়ে চাঙ্গা করল। সেই থেকেই মনে হয় এটার উৎপত্তি। ওই রাগটা এখনও ভুলতে পারেনি হাবু। বউ নেই যে বউয়ের ওপর ঝাল ঝাড়বে। তাই পয়সা খরচা করে লোকেদের গাঁট্টা মেরে হাতের আর মনের খানিকটা আশ মেটায়। এটাকে বলে—

'এটা কি করে সারবে গৌরমামা?'

গৌরমামা একটু ভাবল তারপর আরেকটা বই নামাল র‍্যাক থেকে। বেশ খানিকটা ঘেঁটেঘুটে গৌরমামা বলল, 'এটা পুরো মানসিক ব্যাপার, এর একটাই ওষুধ আছে।' হাবু যদি রাস্তার লোকেদের মাঝখানে একটা ষণ্ডাপানা লোককে ধরে পিটতে পারে আর রাস্তার লোকেরা ওকে বাহবা দেয়, চাপা রাগটা একসঙ্গে গল গল করে বেরিয়ে যাবে। তাহলে দেখবি ঠিক শুধরে যাবে।'

আমি সেজদা আর ছোটমাসি আমাদের ঘরে ঢুকে অনেক পরামর্শ করলাম। এ তো, ভারি শক্ত কাজ। রাস্তার ষণ্ডামার্কা কাউকে ধরে পিটলে সেই-তো উল্টে পিটে দেবে সেজমামাকে। অনেক ভেবেও কিছু ঠাহর হল না। মা ছোটমাসিকে বলল, 'রমা তুই এখানেই খেয়ে নে, বেলা অনেক হল।' বহু জল্পনা কল্পনার পর বিকেল চারটের সময় একটা পছন্দসই প্ল্যান হল। সেজদাকে এমনিতে বোকা মনে হলেও প্ল্যানটা কিন্তু সেজদার মাথাতেই এল। সেজদা উত্তেজিত হয়ে, তোতলাতে শুরু করে এমন বিষম খেল যে আমরা প্রথমে ওর কথায় ভাবলাম বড়মামাকে ধরে ঠেঙাতে বলছে।

ছোটমাসি বলল, 'ছিঃ। বড়দার কতো বয়স জানিস। এক ঘুষি খেলে মারাই পড়বে।'

সেজদা ইশারায় আমরা ভুল বুঝেছি জানিয়ে যা বলল তাতে আমি বললাম, 'সেজদা, মেজমাসিকে দেখে কাবলীওলা মনে হয় তা ঠিক, কিন্তু বললে নিশ্চয়ই খুব চটে যাবে।'

সেজদার উত্তেজনা কমাতে অনেক কসরৎ করতে হল। ছোটমাসি, 'ওকে অন্যমনস্ক না করলে হবে না' বলে সেজদার প্রিয় একটা গানের সুর গুনগুন করে উঠল। প্রিয় গান টান শুনে সেজদার উত্তেজনা একটু কমল।

অনেক কষ্টে সেজদার প্ল্যানটা পরিষ্কার বোঝা গেল। আমি তক্ষুণি একছুটে গিয়ে

ন্যাপলাকে ধরে নিয়ে এলাম। ন্যাপলা বয়সের তুলনায় দেখতে অনেক বেশী লম্বা চওড়া।

ন্যাপলাটার sporting spirit আছে বলতেই হয়, প্ল্যান শুনে বলল, 'কাবলীওলা সেজে একটা ঘুষি খেয়ে সামলাতে পারব না? কী যে বলিস? কিন্তু কাবলীওলার ড্রেস ভাড়ার টাকাটা আগাম দিবি।'

সেজমামার ঘরের সামনের দালানে একটা টেলিভিশন সেট আছে। বারোয়ারি টেলিভিশন, যে যখন পারে এসে দেখে। সেজমামার ঘরে যথারীতি আড্ডা চলছে। গৌরমামাও আড্ডায় আছে কিন্তু কথামতন কিছুটি বলেনি সেজমামাকে। সেজমামা একবার আমাদের টিভির আওয়াজ কমাতে বলল, আমরা কমালাম কিন্তু এমন হট্টগোল শুরু করলাম যে সেজমামাদের আড্ডা নটার ভেতর ভেঙ্গে গেল।

আমি ছোটমাসি আর সেজদা সেঁধিয়ে পড়লাম সেজমামার ঘরে।

'কি চাই'?

'একটা সমস্যার বোহঃও করতে হবে সেজদা', বলল ছোটমাসি।

'সমস্যাটা কী?'

'তুমি বেরিয়ে গেলেই একটা কাবলীওলা রোজ বাড়ির সামনে এসে হট্টগোল করে। কাকে টাকা ধার দিয়েছে। সে নাকি এখানেই থাকে। সেই লোকটাকে খুঁজে না পেয়ে যাচ্ছেতাই চেঁচামেচি করে।'

আমি বললাম, 'পাড়ায় আর আমরা মুখ দেখাতে পারছি না।'

'কেন? কেন?' উদগ্রীব হয় সেজমামা।

ছোটমাসি বলল, 'পাড়ার লোকে বলছে তোমার মতন বক্সিং, জুডো, ক্যারাটেবিদ বাড়িতে থাকতেও আমরা ঐসব মেনে নিচ্ছি? আজ

লোকটা শাসিয়ে গেছে কাল সকালে আসবে। তুমি পারবে না লোকটাকে একটা জুডো বক্সিং বা ক্যারাটের প্যাঁচ লাগাতে?'

সেজমামা অনেকক্ষণ আয়নার সামনে চুল আঁচড়াল, আমরা বুঝলাম সেজমামা ভাবছে কী করবে। কারণ অতক্ষণ আঁচড়ানোর মতন চুল সেজমামার নেই।

চুল আঁচড়ানো শেষ হলে সেজমামা ক'টা প্রশ্ন করল।

'কাবুলীওলাটা কি খুব ষণ্ডা গোছের?'

'মোটেই না।'

'খুব মারকুটে ধরনের?'

'একদমই না।'

'জুডো, টুডো জানে।'

একটু বিষম খেল ছোটমাসি।
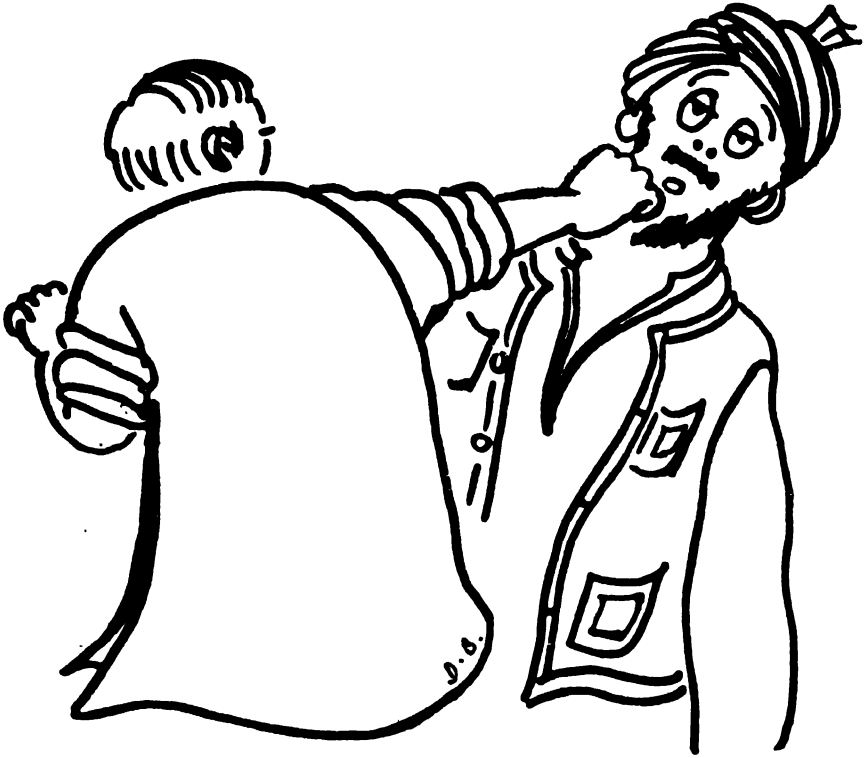
'অত শত জানি না, কিন্তু গত সপ্তাহে পাশের পাড়ায় একটা লোক ওকে ঠেঙিয়ে পাট করে দিয়েছিল। কাবুলীওলাটা কিস্যু করেনি। ওর মুখেই যত গরম আর তড়পানি।'

সব শুনে সেজমামা গর্জে উঠল, 'আমাদের বাড়ির তলায় চ্যাংড়ামি? বেটাকে বুঝিয়ে দেব।'

রাত্তিরে আমরা সক্কলে মামাবাড়িতেই থেকে গেলাম।

বড়দিদা বললেন, 'কী রে? বাবা খুব বকেছে নাকি?'

সক্কালবেলায় সকলের হৈ-চৈয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাতসক্কাল বেলা এক বদখত্ কাবলীওলা বাড়ির সামনে বিকট চেঁচাচ্ছিল। সেজমামা নীচে নেমে তাকে এমন এক ঘুষি মেরেছে যে সে এক্কেবারে ফুটপাতে চিতপাত। কাবুলীওলার চেঁচানি থামাতেই সেজমামার ঘুষি। রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেছিল, তারা সক্কলে সেজমামাকে বলেছে। 'সাবাস দাদা, দারুণ দিয়েছেন দাদা। পাড়ার ভেতর চ্যাংড়ামি।'

ছোটমাসি আর সেজদা আগেই উঠেছে। ওরা ঘটনাটা দেখেছে। ছোটমাসি তো আমায় প্রায় জড়িয়ে ধরল, 'কি ভালো সেজেছিল ন্যাপলাটা, দেখে আমরাই চিনতে পারছিলাম না।'

সেজমামার ঘরে গিয়ে দেখি সেজমামা একটা রয়েল বেঙ্গলের মতন পায়চারি করছে। 'বাছাধন এক ঘুষিতেই কাত। তাও তো জুডো, ক্যারাটে ঝাড়িনি। বলে কিনা আবার আসবে দলবল নিয়ে। এমন জুডো ঝাড়ব না......, সেজমামা একটা বিকট অঙ্গভঙ্গী করে ছোটমাসিকে প্রায় মেরেই বসছিল।

আমরা সেজমামাকে ধরলাম, 'তোমাকে খাওয়াতেই হবে। এত বড় এচিভমেন্ট, খাওয়াতেই হবে।'

সেজমামা এককথায় রাজি 'ঠিক আছে, মুরগি আর রসগোল্লা হয়ে যাক। আমি টাকা দিচ্ছি, তোরা নিয়ে আয়।'

আমি আর সেজদা মুরগি আনতে বাজারে বেরুচ্ছি, এমন সময় ন্যাপলা হাজির। ন্যাপলাকে দেখে ছোটমাসি দৌড়ে এল, 'দারুণ দিয়েছিস। কে বলবে ওটা আসলে তুই, কোনও কাবলীওলা নয়।'

ন্যাপলার তেমন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ন্যাপলা বলল, 'দুদিন আগে বলবি তো। কাবলীওলার পোশাকটা আজ পাওয়া গেল না। আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।'

ন্যাপলার কথা শোনার পর, কম করে কুড়ি সেকেণ্ড লাগল আমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সাতসক্কালে সেজমামা সত্যিকারের কোনও কাবলীওলাকে ধরে ঠেঙিয়ে দিয়েছে। আর সে দলবল নিয়ে আসার হুমকি দিয়ে গেছে। একপাল ষণ্ডামার্কা কাবলীওলা এলে যে কি হবে ভেবে আমার দমবন্ধ হয়ে এল। ছোটমাসি নীরবে চোখের জল মুছতে লাগল আর সেজদা ভীষণ নার্ভাস হয়ে নিজের মনে ব্যাকরণ কৌমুদি আওড়াতে থাকল।

আমি ন্যাপলার দিকে ভীমরুলের মতন তেড়ে গেলাম। 'হতভাগা, ননসেন্স, অক্টোপাস, জিবেগজা কোথাকার।'

সেজদা বলল, 'চাম-চাম চা........

ন্যাপলা চটে উঠল, 'চামচে বলবে না খবরদার, ওগুলো ভীষণ ব্যাঁকা হয়।'

সেজদা বুঝিয়ে দিল যে চামচে বলেনি, চামচিকে বলেছে। তাতে ন্যাপলা ঠাণ্ডা হল। 'ওঃ। তাই বল!'

আমি আমার ঝাল ঝেড়েই চললাম, 'ইডিয়ট, হরতুকী কোথাকার। দে ড্রেস ভাড়ার পঁচিশ টাকা ফেরত দে।'

ন্যাপলা আমার কথায় কান না দিয়ে হেসে বলল, 'তুই আমাকে এত দায়িত্বহীন ভাবিস? ছিঃ।'

'মানে?'

'আরে বাবা কাবুলীওলার ড্রেস না পেয়ে, আজ সকালে আমিই তো ওই কাবুলীওলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা ঘুষি খেতে কত নেবে? একটু দরাদরির পর খুশিমনেই ও পঁচিশ টাকাতে রাজী হল। ঘুষি খেয়ে ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা। একগাল হেসে কি শুধোল জানিস?'

'কী?'

'এয়সা মামা ঔর আছে? আছে না কিরে?'

আর আমি একটু হাঁফ ছাড়লাম, 'তোর অত খোঁজে দরকার কী?'

একটু লজ্জা পেল ন্যাপলা। 'বাঃ! আমাকে পাঁচটাকা কমিশন দিয়েছে না।'

কামিয়ে কামান উদ্যোগ

আমাদের পাড়ায় একটা নতুন সেলুন খুলেছে। দেখার মতন সেলুন। খুব সাজানো গোছানো। দেওয়াল জোড়া আয়না। তার সামনে এক সারি চেয়ার। ডেন্টিস্টদের চেয়ারের মতন সব চেয়ার। চেয়ারের কাছে চিরুনি কাঁচি নিয়ে ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ করে কসরৎ দেখায় নাপিতেরা আর চেয়ারের লোকগুলো কেমন অসহায় অসহায় মুখ করে তাকিয়ে থাকে। পাশে একটা লম্বা বেঞ্চি। অপেক্ষা করার জন্য। সেখানে বসে, লোকে চুলকাটার হরেক কসরৎ দেখে আর নাপিতদের সঙ্গে বক্‌বক্ করে, যতোক্ষণ না নিজের দান আসে।

ডেন্টিস্ট মার্কা চেয়ারগুলো প্রথমে দেখলে অবাক লাগে কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়। চেয়ারগুলো খাড়া করা যায়, হেলানো যায়, শোয়ানোও যায়।

দাঁত তোলা আর চুলকাটার অনেক মিল আছে। প্রথমটায় জানা থাকে না ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আদৌ দাঁড়াবে? নাকি শুয়ে পড়বে। তাই বোধ হয় অমন চেয়ার।

পাড়ার চেনা সেলুনগুলো আমার দাড়ি কামাতে তেমন রাজী হয় না। আমি টুক

করে নতুন সেলুনে ঢুকে, বেঞ্চিটাতে বসে পড়লাম। পাশের লোকটাকে শুধোলাম, 'আমায় দাড়ি কামানোর জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে দাদা?'

লোকটা অকারণে খ্যাঁক করে উঠল, 'আমাকে দেখলে কি নাপিত মনে হয়?' আমারও মেজাজ বিগড়ে গেল।

'আপনাকে দেখলে হনুমানের কথা মনে হয়' বলতে গিয়েই খেয়াল করলাম লোকটার বিশাল চেহারাখানা। হনুমানের 'হু' টা মুখে এসে গিয়েছিল, বাকিটা চট করে বদলে 'হুমায়ুন' করে দিলাম।

লোকটা বোধহয় যাত্রা থিয়েটার করে। খুশি হয়ে গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'ওই পরামাণিকদের কাউকে জিজ্ঞেস করো না!'

পরামাণিক কথাটার মানে আমি জানতাম না। লোকটা আমার মুখ দেখে নিজে থেকেই বলল, 'আরে নাপিতের অনেক নাম। পরামাণিক, নাপিত, নরসুন্দর, ক্ষৌরকার আবার কচ্ মানে তো চুল, চুলের শত্রু বলে অনেকে কচ্ যুক্ত অরি সন্ধি করে কচারিও বলে। বুঝলে..........'

আমি বোঝার চেষ্টা করলাম।

বেঞ্চিতে বসে দেখতে বেশ লাগছিল। একজন নাপিত তার সামনে বসা লোকটার মাথায় হরেক রকমের চাঁটি আর গাঁট্টা মারছিল আর লোকটা ক্রমাগত ঝিমোচ্ছিল। আমি হুমায়ুনকে বললাম, 'কী ঘুমকাতুরে দেখেছেন! অত চাঁটি খেয়েও উঠছে না।'

হুমায়ুন বলল, 'তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না। ওকে বলে ম্যাসেজ ওতে দারুণ আরাম হয়। লোকটা চাঁটি খেয়ে উঠবে কি! ও তো চাঁটির চোটেই ঘুমিয়ে পড়ছে।'

সত্যি বলেছে হুমায়ুন। লোকটা একটু পরেই ঝিমুনি ছেড়ে উঠে আড়মোড়া টাড়মোড়া ভেঙে একটু মুচকি হেসে পকেট থেকে নাপিতকে, বেশ ক'টা টাকা দিল।

আমি হুমায়ুনকে বললাম, 'খাসা ব্যাপার তো, মাথায় চাট্টি চাঁটি মেরে পয়সা রোজগার।'

অনেক লোক। সবে দাঁড়িয়ে উঠে কত দেরি হবে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, এমন সময় চুলে খুব সুন্দর কায়দা করা এক ছোকরা গলা বাড়িয়ে বেশ গদগদ কণ্ঠে বলল, 'ভালো আছেন স্যার?'

স্যার শুনতে কার না ভালো লাগে। আমি একবার আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলাম।

'আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে স্যার' বলে ছেলেটা কি একটা ফর্ম আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গলাটা ভারি করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আবার কী?'

ছোকরা একটু হাত কচলে অনুনয় করল, 'এটা নিখিল বঙ্গ নরসুন্দর সমিতির পৃষ্ঠপোষকতার ফর্ম।'

আমি ফর্মটা উল্টেপাল্টে দেখলাম তাতে লেখা '**নিখিল বঙ্গ নরসুন্দর সমিতির কামিয়ে কামান উদ্যোগ।**'

'আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে বিনা বেতনে চুলকাটা দাড়িছাঁটা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে মানুষের বেকারত্ব ঘোচাব। স্বাক্ষর হলে মানুষ পড়তে পারে চাকরি পায়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা কামিয়ে কামানোর রাস্তাটা চিনিয়ে দেব মানুষকে। মানুষের সব দুর্দশা ঘুচে যাবে। আপনার মতন মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালে আমাদের অগ্রগতি ও সাফল্য অনিবার্য। আমরা প্রথমে.........'

ছোকরা বলল, 'কামিয়ে কামান কথাটা কেমন?'

আমি বললাম, 'খাসা। কিন্তু চুল কাটার এতো শেখার কী আছে?'

ছোকরার মুখটা এবার দেখার মতন হল। আকাশ থেকে পড়ে 'হাসালেন স্যার' বলে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'অত সোজা না। আপনার চুলটা যে হতভাগা কেটেছে সে কিস্‌সু জানে না। আপনার হাতে কাঁচি ধরিয়ে দিয়ে কারুর চুল কাটতে বললে কী করবেন বলুন তো?'

'কেন ঘ্যাচাং করে ——'

'একটা ফ্যাচাং পাকাবেন তো—' আমায় থামিয়ে দেয় ছোকরা। 'কাঁচি টাচির কত কারবার বারবার রপ্ত করে তবে চুল কাটা শেখা যায়। ঘ্যাচাং শুধু চলে খুব লম্বা চুলের বেলায়'

আমি অবাক মুখে তাকালাম, 'তাই বুঝি!'

বাঁ হাতে চিরুনি আর ডান হাতে কাঁচি ধরে আমাকে বোঝানোর জন্য ছোকরা চুলছাঁটার রিহার্সাল শুরু করে দিল। নিজের মনে আওড়ে চলল, 'চুলকাটার, দাড়িকাটার ঠিক তবলার মতন বোল আছে। 'তাক তেরে কেটে তার' মতনই, 'কুচ কুচ কুচ ক্যাঁচ'। কুচ কুচে কুচ খ্যাঁচ' মুখের সঙ্গে হাতও চলতে থাকে ছোকরার। কখনও ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যায়, কখনও পিছিয়ে আসে।

'কুচ কুচ খ্যাঁচ খ্যাঁচ। কুচ করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ—'

'বাবাঃ! প্রচুর মারপ্যাঁচ!' অবাক হলাম আমি।

'হ্যাঁ। মাথার পেছনে থাকে বলে বোঝা যায় না। কিন্তু ভারি শক্ত

কাজ। অনেক রেওয়াজ করতে হয়। তবে পয়সা আছে এ লাইনে। BA., MA., পাশেরাও কামাতে পারবে না আমরা যা কামাই।'

'আহা কামানোর জন্যেই তো অত কুচ কাচের কুচকাওয়াজ, অতো সাধাসাধি।'

'সে কামানো না। নোট কামানোর কথা বলছি আমি। তিনমাস ট্রেনিং নিয়ে কয়েকটা কাঁচি চিরুনি ক্ষুর আর দুটো ইট সম্বল করে, বিএ, এমএ, পাশের সেজমামারাও পারবে না অত কামাতে!'

আমি মনে মনে কল্পনা করি 'আমার সেজোমামা বিএ, এমএ, পাশ। ঠিক বলেছে ছোকরা। ইটে বসে কামানো তো দূরের কথা। ইটে ভালো করে বসতেই পারবে না। যা ভুঁড়ি।'

ছোকরা বলে চলে, 'লোকে ঠাট্টা করে বলে ইটালিয়ান সেলুন। তা বলুক। ইটের পরে ইটের পিঠে চড়তে চড়তে কদিনেই বড় বাড়ি।

'একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না—'

'একটুও না। শুধু বড় বাড়িই না। তার সঙ্গে এমন সেলুন। কদিন না যেতেই ফুলতে ফুলতে বেলুন। একথা কিন্তু অনেকেই জানে স্যার। বিশ্বাস করবেন না আমাদের কামিয়ে'কামান উদ্যোগে' বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর অ্যাপলিকেশন পড়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ। আপনার মতন মহান মানুষেরা পাশে দাঁড়ালে আমরা দেখিয়ে দেব। প্রচুর ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে উপার্জুন করিয়ে দেব।'

উপার্জুন কথাটার আমি ঠিক মানে বুঝলাম না। প্রায় অর্জুনের মতন কিছু হবে নির্ঘাত। দুহাতে কাঁচি চালাবে। আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। বাজে কথা বলেনি ছোকরা। এ এক মহান উদ্যোগ। সকলের সাহায্য করাই উচিত। কতো ছেলে অর্জুনের মতন দু হাতে চুল দাঁড়ি ছাঁটতে পারবে। আনাড়ির মতন কাঁচা হাতে ক্ষুর কাঁচির হাতাহাতিতে হতাহত হবে না। ছোকরা আমার নাম লিখে নিল ফর্মে। সই করার সময় একটু এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। ছোকরা বলল, 'পাড়ার ছেলে হয়ে বেকার ভয় পাচ্ছেন কেন স্যার? ওই যে সামনে তিনজন চুল কাটছেন ওঁরা সকলেই পৃষ্ঠ-পোষক হয়েছেন।'

ওই 'ভয় পাচ্ছেন' কথাটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমি ছোকরার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ফর্মটায় সই করে দিলাম, তাকিয়ে দেখি হুমায়ুন আমাদের কড়া নজরে লক্ষ্য করছে।

ছোকরা বলে চলল, 'আরও কতো রকমের শিক্ষা আছে এ লাইনে। আমাদের খুব বকবক করতে শিখতে হয়, যাতে কাস্টমার ঘুমিয়ে না পড়ে। টেকো লোকদের একটু বসিয়ে রেখে ভূতের বা ডিটেকটিভের গল্প পড়াতে হয় যাতে সব চুল খাড়া হয়ে ওঠে। তাতে চুল কাটার অনেক সুবিধে। খুঁজে খুঁজে কাটতে হয় না। তারপর ফার্স্ট এডের অনেক কিছু শিখতে হয় আমাদের। দাড়ি কামাতে কামাতে, নাক বা কান কামিয়ে ফেললে, মানে কম্বিয়ে ফেললেও বলতে পারেন কী করা উচিত।'

আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি, 'সেকি! দাড়ি কামাতে কামাতে নাক কানও নামাতে পারে, নাকি!'

ছোকরা বলে, 'আপনি, আবার ভয় পাচ্ছেন দেখছি। দাড়ি কামাতে গিয়ে যাতে নাক কামিয়ে না দেয় তাই তো আমাদের শিক্ষা-শিবির। ওসব অশিক্ষার ফল। পরশুদিনই তো বর্ধমানে, এক বেটা, খরিদ্দারের একপাশের কান আর নাক চেঁচে সাফ করে দিয়েছে। ভালো ট্রেনিং ছিল না বলেই না—। খুব ভালো হল আপনি আমাদের পৃষ্ঠপোষক হলেন—। কাল রবিবার সকাল আটটার সময় এখানেই জরুরী মিটিং। নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু স্যার। ভয়ের কিচ্ছু নেই। আপনি যদি ভুলে যান তো আমি ডেকে আনব। আমি আপনার বাড়ি ভালো করেই চিনি। ওই তো দেখা যাচ্ছে, হলুদ রঙের।'

আমি কিছু না বলে হুমায়ুনের পাশে গিয়ে বসলাম। হুমায়ুন এতক্ষণ সমস্ত কিছু দেখছিল। সে আমাকে একটু চুপিসাড়েই বলল, 'নিজের সর্বনাশটা করলে তো! আমাকেও ওই ছোকরা হতভাগা মিনমিনে গলায় ওসব বলতে এসেছিল, আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। তুমি কাল বুঝবে।'

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। 'কি বুঝব হুমায়ুনদা—'

'পৃষ্ঠপোষকতার মজা বুঝবে।'

'মানে?'

'তোমার পৃষ্ঠ, তোষকে শোবে—কম করে ছ মাস। আরে বাবা সামনের তিনজন পৃষ্ঠপোষক যারা চুল ছাঁটতে এসেছিল তাদের সক্কলকে নেড়া হতে হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ—'

আমি সামনের চেয়ারে বসা তিনজনের দিকে তাকালাম। সত্যিই ওরা তিনজন হাফ নেড়া হয়ে বসে আছে আর নাপিতেরা গল্প করছে নিজেদের মনে। আমার আত্মারাম রামনাম করে উঠল। হুমায়ুন বলে চলল, 'কিছু বুঝলে?'

'খুব ভয় করছে—'

'করারই কথা। ওই তিনটে পৃষ্ঠপোষককে তোমার মতন বোকা পেয়ে তিনটে আনাড়ি শিক্ষানবীশের হাতে গুঁজে দিয়ে নাপিতবাবুরা মজা মারছেন। আমি আগাগোড়া সব দেখেছি। শুরুতেই, কাটার নামে, চুল এমন বিশ্রীভাবে জায়গায় জায়গায় কপ্‌চে দিয়েছে যে পৃষ্ঠপোষকদের নেড়া হওয়া ছাড়া গতি নেই। তাও তো এখনও কারও নাক কান নামিয়ে দেয়নি। দু-চারটে উঃ আঃ শুনলাম; মানে অল্প স্বল্প কেটেছে, এখন মাথার অর্ধেক কামিয়ে বাবুরা ইয়ার্কি দিচ্ছেন। সারাদিন দেরি করলেও আধকামানো মাথা নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের পালানোর উপায় নেই। আমরা ক'জন সেই কখন থেকে চুল কাটব বলে বসে আছি তা হতভাগাদের হুঁশই নেই। আর ওরা পৃষ্ঠপোষক বলে, সই করে দিয়েছে অতএব নাককান কামিয়ে দিলেও কিচ্ছু বলার নেই।'

হুমায়ুনের কথায় আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। মাথার ভেতরটায় কেমন পাক দিল। সইটা না করলেই ভাল হত।

আমি উঠে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম দাড়ি কামানোর জন্য আমাকে আর কত অপেক্ষা করতে হবে। সে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে আমার গালে একটু হাত দিয়ে বলল—'তা বছর দুয়েক তো বটেই।'

আমার রাগ ধরে গেল। আমি আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পাই আমার দাড়ি গজিয়েছে কিন্তু সব সেলুনগুলো আমাকে এই একই কথা বলে। এই নতুন সেলুনটাতে পরখ করতে না এলেই হত।

আমি ফিরতে যাচ্ছিলাম। সেই বিশ্রী ঘ্যানঘ্যানে ছোকরাটা এসে আমায় মনে করিয়ে দিল। 'কাল সকালে কিন্তু আপনাকে ডেকে আনব স্যার। জরুরী মিটিং আছে।'

হুমায়ুনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময় একটা দমকা হাঁচির আওয়াজ শুনলাম, তার পরেই 'বাবাগো' বলে এক পেল্লায় আর্তনাদ। আমি হুমায়ুন আর অন্য যারা ছিল একটু এগিয়ে দেখলাম তৃতীয় চেয়ারে আধকামানো পৃষ্ঠপোষকের মাথায় রক্তের ধারা। মুহূর্তে সকলের আতঙ্কিত চুল খাড়া হয়ে উঠল। চুলকাটা চুলোয় দিয়ে যে যার সরে পড়তে লাগল। আমি ভীষণ ভড়কে গিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে দেখলাম হুমায়ুন টুমায়ুন সব হাওয়া, কিন্তু সেই ছোকরা এমনই নির্লজ্জ, যে কাছে এসে আমাকে আবার বলল, 'ও কিচ্ছু না। অমন হয়। কাল কিন্তু সকালে আপনাকে ডেকে আনব প্রাণগোপালবাবু। ভয় পাবেন না।'

এই শেষ 'ভয় পাবেন না' টাতে যে কি ভয় পেলাম কী বলব। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল কাল সকালের দৃশ্য। আমার নাক নেই। সারা মুখে রক্তারক্তি। আমার মাথায় কেমন একটা চক্কোর দিল। গা বমি করল। আমি ঘোষেদের রোয়াকে ধপ করে বসে পড়লাম, একটু ভেবে বুঝলাম এই বিপদে আমার গণেশের কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। গণেশ আমার প্রাণের বন্ধু, গানের বন্ধু, কাজের বন্ধু, অকাজের বন্ধু। ক্লাসে কম নম্বর পেলে কী হয়, গণেশের প্রচণ্ড বুদ্ধি। তার ওপর ক্যারাটে জানে। আমি নাকেমুখে কোনও রকমে দুটো গুঁজে গণেশের বাড়ি ছুটলাম।

গণেশ ওদের বাড়ির রোয়াকে বসে খুব মন দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুরকে কীসব খাওয়াচ্ছিল, বিরক্ত মুখে তাকাল আমার দিকে। 'আমি জানতাম —শান্তিতে মন দিয়ে কোনও কাজ করা সম্ভব নয় তোদের জ্বালায়—'

'তোর আর ইঁদুর নিয়ে খেলার বয়স নেই গণেশ—'

'তোকে বলেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, যারা নোবেল প্রাইজ পায়, তারা মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত ইঁদুর নিয়ে কাজ করে। আমি দেখছিলাম কতোটা দোক্তা খেলে ইঁদুরটার নেশা হয়। তুই সব গুবলেট করে দিলি। এখন আর হবে না।' বলে গণেশ নেংটি ইঁদুরটাকে একটা ঠোঙায় মুড়ে বুকপকেটে চালান করে দিল।

আমার সব কথা খুব মন দিয়ে শুনে গণেশ বলল, 'খুব জটিল পরিস্থিতি বলছিস? কিন্তু তোর যা চুলের ছিরি তাতে দেশের স্বার্থে একটু কাটতে দিলে তোকে এর চেয়ে খুব একটা কিছু খারাপ দেখাবে না।'

আমার একটু অভিমানই হল, সেটাকে চেপে গিয়ে বললাম, 'তারপর যদি রক্তারক্তি হয়, যদি নাককান কামিয়ে দেয়, তখন?'

'ওটা কোনও ব্যাপারই না। আজকাল হার্ট কিড্‌নী সব অন্য লোকের লাগিয়ে দিচ্ছে। অন্যের নাককান লাগিয়ে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই না। তুই ভয় পাচ্ছিস তাই বল।'

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। গণেশ আমার প্রাণের বন্ধু। আমাকে আমার চেয়ে ভালো চেনে। কথাটা বলেই ফেললাম — 'ভীষণ ভয় করছে গণেশ। কেন যে মরতে পৃষ্ঠপোষকতার সইটা করতে গেলাম। কাল সকালে ওরা আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাবে একরকম বলি দিতে, তখন তো প্রেস্টিজের খাতিরে ভয়ের কথা বলতে পারব না। পালিয়েও যেতে পারব না। যেতেই হবে ওদের সঙ্গে। মাথাটা নেড়া হয় হোক। কিন্তু নাক কান নিয়ে ফেরা যাবে বলে মনে হয় না। ভীষণ কষ্টের ব্যাপার গণেশ! তুই একটু ভাব, কীকরে এই বিশ্রী পৃষ্ঠপোষকতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।'

গণেশ একটু ভেবে বলল, 'নাক না থাকলে বা অন্যের নাক লাগালে তোর identity মানে পরিচয় নিয়েও সমস্যা দেখা দেবে। তুই তখন কে? যার নাক সে? না আমাদের পানু? যার নাক, সে যদি তোর সম্পত্তিতে বা পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেটে ভাগ বসাতে চায়?'

আমি আর গণেশ অনেক ভাবলাম, অনেক রকম যুক্তি করলাম। কিন্তু কোনও ফন্দিই ঠিক পছন্দ হল না। গণেশের খেলার মাঠে যাওয়া হল না। আমার কোচিংএ পড়তে যাওয়া হল না। আমি আতঙ্কিত হয়ে ভেবে চললাম আর গণেশ থেকে থেকে উদ্ভট সব পরিকল্পনা হাজির করতে লাগল। সন্ধে গড়িয়ে যখন রাত্তির হতে চলেছে তখন গণেশ হঠাৎ ইয়াংফুঃ বলে লাফিয়ে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম, 'কী হল গণেশ? পেট কামড়ালো?'

গণেশ ধমকে উঠল, 'ইডিয়টের মতন কথা বলিস না। দারুণ একটা আইডিয়া এসে গেছে।'

'কী?'

'তুই কাল সকালে কেউ কিছু জানার আগেই নেড়া হয়ে যা।'

'যাঃ। বাজে বকিস না।'

'আমি বাজে বকছি না। আগেভাগে নেড়া হয়ে গেলে তোর আর ভয় থাকবে না। তোর ওপর তো নাপিতদের লোভ নেই। ওদের লোভ তোর চুলের ওপর। আগে থেকে চুল কামিয়ে রাখলে বাছাধনেরা তোর ওপর হাত মক্‌সো করার চান্সই পাবে না। নাক কামানো তো দূরের কথা।'

আমি পড়লাম দ্বন্দ্বে। একটু ভেবে দেখলাম প্ল্যানটা কাজের। কিন্তু চুলের জন্য প্রাণটা হু হু করে উঠল। আমি চুল ঠিক করতে করতে গণেশকে বললাম, 'গণেশ চুল ছাড়া বাঁচব না রে।'

গণেশ বলল, 'তাহলে নাক কান ছাড়া বাঁচার চেষ্টা কর। আরে বাবা, চুল তো কদিন বাদেই ফের গজাবে কিন্তু নাক কান একবার গেলে কি আর গজাবে?'

'ঠিক জানি না। গজায় না। না রে?'

'না গজায় না। নাকের জন্য নরুন দিতে হয়। তুই নাকের জন্য তো শুধুমাত্র চুল দিচ্ছিস। তা ছাড়া, চুল না থাকার সুবিধে অনেক। পালোয়ানরা সুবিধের জন্য সকলে নেড়া হয়ে নেয়। ওরা বলে বেকার ঝঞ্ঝৌটি। মানে বেকার ঝঞ্ঝাটের ঝুঁটি। তা ছাড়া গরমকালে আরামও লাগে খুব, আর চুল আঁচড়ানোর সময়টাও বাঁচবে।'

'বাড়িতে কী বলব?'

'বাড়িতে বলে দিবি পাশ করার জন্য মানত ছিল তারকেশ্বরের কাছে।'

'তা তো বলা যাবে না। পাশ তো.....'

'তাহলে ফেল করার জন্য ছিল বলবি। ওঃ সেটাও তো বলা যায় না। উঃ! যা পছন্দ হয় তাই বলবি বাড়িতে, বলবি দাঁত কন্‌কন্‌ করছিল। ওটা কোনও সমস্যাই নয়। এদিকে মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে আর উনি বাড়ির কথা ভেবে হিমসিম খাচ্ছেন।'

ঠিক হল পরের দিন ভোরে আমি নিউ আর্ট সেলুনে গিয়ে নেড়া হয়ে যাব। গণেশ থাকবে আমার পাশে।

নেড়া হওয়ার যে কী কষ্ট, কী দুঃখ, কি জ্বালা তা বেশির ভাগ মানুষই ভাবতে পারবে না। আমি শেষ বারের মতন, সেলুনের আয়না দেখে, আমার চুলগুলো সেট করে নিলাম। আমার অত সুন্দর চুল, যাদের পেছনে আমি দিনে কম করে দেড় ঘণ্টা খরচ করি, তারা চলে যাবে, এই দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল।

চেয়ারে বসলাম। এককে গোছা চুল কামিয়ে দেয় আর আমার মনের মধ্যে শনশন করে একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। মনের ভেতরটা হুহু করে ওঠে।

গণেশ আমার পাশে দাঁড়িয়ে নাপিতকে নির্দেশ দিচ্ছিল যাতে এক গাছা চুলও বাকি না থাকে। আর মাঝে মাঝে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'আরে ক'টা তো মোটে মাস। নাক কানের বদলে কিছুই না।'

নেড়া হওয়া শেষ হলে আমি নিজেকে নিজেই চিনতে পারলাম না আয়নায়। মনে হল অন্য কারও চোখে জল।

গণেশ বলল, 'ব্যাস। আর ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। তোকে যা সময় দিয়েছে নরসুন্দর সমিতি তাতে সভা এতক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। নির্ভয়ে সটান সেঁধিয়ে পড়বি। তোর পেছনে আমি থাকব। ক্যারাটে-ফ্যারাটের যদি প্রয়োজন হয় তো কোনই পরোয়া নেই।'

নরসুন্দরদের সভায় ঢুকে কী বলব আমি আর গণেশ ঠিক করে নিলাম।

নতুন সেলুনটাতে ঢুকে আমার আর গণেশের মনে হল সভার কাজ শুরু হতে একটু সময় বাকি। রবিবার সকাল। যাবতীয় চেয়ার বেঞ্চি জড়ো করে, একটা নীচু টেবিলের চারপাশে গোল করে সাজিয়ে, বসার বন্দোবস্ত হয়েছে। বেশ ক'জন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। কালকের মাথা নেড়া তিন পৃষ্ঠপোষকও আছেন।

হেডনাপিতকে আমি চিনতাম। দাড়ি গোঁফ ছাঁটা রাবণের মতন দেখতে। আমার আর গণেশের দিকে সে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল। কালকের ছোকরা এগিয়ে এল কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না।

গণেশ বলল, 'এই তো আপনাদের পৃষ্ঠপোষক প্রাণগোপালবাবু।'

আমাকে নিরীক্ষণ করে ছোকরা আর রাবণের মুখগুলো বিরাট হাঁ হয়ে গেল। চোখগুলো গোল হয়ে উঠল। ছোকরা বলল, 'নেড়া হয়ে গেছেন তো, তাই হঠাৎ চিনতে পারিনি।'

গণেশ বলল, 'নিখিল বঙ্গ নরসুন্দর সমিতির কামিয়ে কামান উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সই করেছেন যখন তখন আনাড়ি শিক্ষানবীশের উপদ্রবে নেড়া হতেই হত। নাককান বাঁচাতে সুবিধে মতন আগেভাগেই নেড়া হয়ে গেছেন।'

এবার রাবণ ওর বিশাল হাঁ-টার ভেতর থেকে বলল, 'কি সব যা তা বলছেন আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের নামে—ওঁরা কত ভালো জানেন—'

আমার মনের ভেতর এতক্ষণ দুঃখ, রাগ, প্রেস্টিজ, ভয় সব রকমের ঢেউ, তুফান, সাইক্লোন, টাইফুন ফুঁসছিল। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। গর্জে উঠলাম। 'বাজে বক্‌ছি মানে? আপনারা গতকাল ওই তিনজন পৃষ্ঠপোষককে শিক্ষার্থী নাপিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে নেড়া হতে বাধ্য করেননি? আর ওই টেকো লোকটা কালকে ওদের একজনের মাথায় ক্ষুর চালিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধায়নি? তার 'বাবাগো' বলে চিৎকারে সব লোক পালায়নি? আমার ওপর আজ, পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ নিয়ে ঠিক ওইরকম করতেন না? জবাব দিন।'

একদমে এতগুলো প্রশ্ন করে পরিশ্রান্ত নেড়া আমি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

সকলে সকলের মুখের দিকে চাইল কেউ কোনও জবাব দিল না। ঝাড়া এক মিনিট আমার প্রশ্নবাণে সকলে স্তব্ধ। তারপর রাবণ এগিয়ে এল আমার দিকে। মোটেই উত্তেজিত নয়। একটু হেসে বলল, 'বেকার নেড়া হলেন প্রাণগোপালবাবু। ওই তিনজন পৃষ্ঠপোষক তো যাত্রাদলের লোক। তিন ভাই—প্রাচীন কুমার, শচীন কুমার, আর কোচীন কুমার।

আগের পালাটা ছিল কুরুক্ষেত্রে কর্ণ তাই লম্বা চুল রেখেছিলেন। সামনের পালা নীলাচলে মহাপ্রভু, তাই তো নেড়া হতে এসেছিলেন তিনজনে। আপনি যাকে টেকো বললেন তার নাম ছট্টুলাল। দশ বছর বয়স থেকে অন্য লোকের চুলের যত্ন নিতে নিতে নিজের সব চুল তুলে ফেলেছে। ওর হাতে আজ অবধি কারও এক মিলিমিটারও কাটেনি। ওই দেখুন ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ। কাল প্রাচীনকুমার হেঁচে ফেলেছিল। প্রাচীনকুমারকে বাঁচাতে গিয়ে ছট্টুলালের বুড়ো আঙুল কেটে যায়। সেই রক্তই লেগেছিল প্রাচীনকুমারের মাথায়। বাবাগো আর্তনাদটা ছট্টুলালের। তাতে যদি খদ্দের পালায় তো আমরা কি করব। শিক্ষার্থী নাপিতদের অ্যাপ্লিকেশন সবে জমা পড়েছে, কাউকেই এখনও নেওয়া হয়নি। এখানে যাদের দেখছেন তারা সক্কলে কম করে বিশ বছর কামাচ্ছে।'

রাবণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, 'আপনি মাথাটা বেকার কামালেন।'

আমি এতক্ষণ হাঁ করে রাবণের কথা শুনছিলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে বুকের ভেতরটা আবার হু হু করে উঠল। সব দোষটাই গণেশের। গণেশকে কষে গালাগাল দেবার জন্য তার দিকে ফিরলাম। হতভাগাটাও তাকে বলা হল না। সে ঠিক সময় মতন সটকেছে।
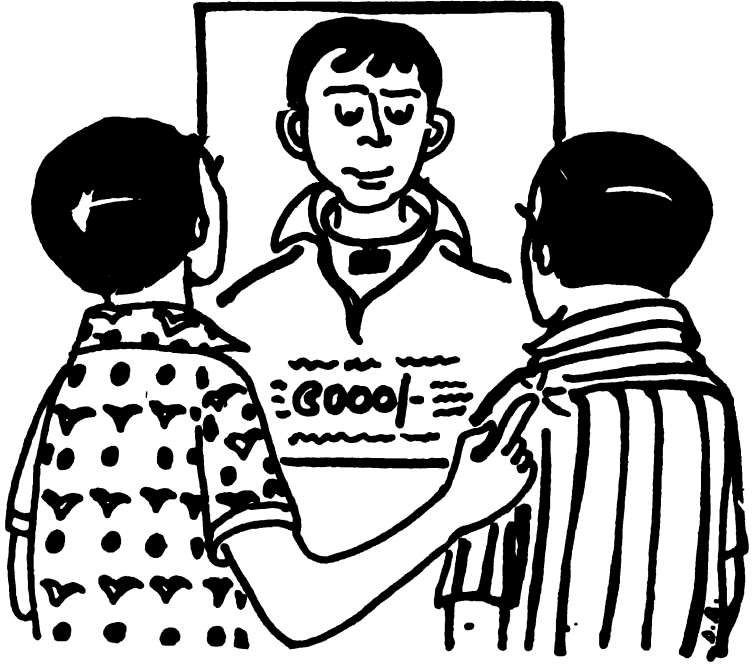
চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং

রবিবার সকালবেলা হেদুয়া থেকে সাঁতার কেটে এসে সবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল গণেশ। হাতে চিনেবাদামের ঠোঙা। আমার মেজাজটা একটু বিগড়েই গেল। রোজ এই সময়ে কেউ না কেউ ডিস্টার্ব করবেই। হয় সেজদা, নয় ছোড়দি, নাহলে অন্য কেউ। মাত্র পনেরোটা মিনিট মনোযোগ দিয়ে চুল আঁচড়াব, তার যো নেই, এদিকে নিজেরা বিয়েবাড়ি যাবার আগে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুল আঁচড়ায় তখন ঘরে ঢুকলেই তো তুলকালাম। ছোট হওয়ার এই বিপদ। গণেশ যতই নিকট বন্ধু হোক না কেন, এই সময়টাতে কাউকেই সহ্য করা যায় না। আমি বললাম, 'দাঁড়া চুলটা একটু.....'

গণেশ যথারীতি আমাকে মাঝরাস্তায় থামিয়ে, হাতে খানিকটা বাদামভাজা ঢেলে দিয়ে বলল, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

আমি চিরুনি মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কাজ?'

গণেশ মুখের ভেতর আরও খানিকটা বাদামভাজা চালান করল, 'কাজটা একটু শক্ত কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং।'

আমি গণেশকে বহুদিন চিনি। তাই কাজটা যে চাঁদে যাওয়া, এভারেস্টে ওঠা, হাউই তৈরি বা ইঁদুর মারা গোছের, যা কিছুই একটা হতে পারে সেটা আমার জানা, তাই বললাম, 'ভণিতা না করে বলেই ফেল না কী কাজ।'

গণেশ শেষ বাদামগুলো মুখে ফেলে ঠোঙাটা মুড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে ফেলতে বললো, 'ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে পারবি?'

মুহূর্তে আমার মানসপটে কতোগুলো ছবি ফুটে উঠল। আমি বললাম, 'না ভাই আমি অতো হামাগুড়ি দিতে পারবো না। আমি অনেক সিনেমায় দেখেছি, ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাতে একটা আতস কাচ নিয়ে মাইলের পর মাইল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত পার হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। তিন হাত পায়ে হামা দেওয়া ভারি শক্ত।'

গণেশকে একটু চিন্তিত দেখায়, 'আহা ওরকম একটু আধটু হামাগুড়ি নামকরা অনেককেই দিতে হয়। সাজাহান থিয়েটারে সাজাহান, মা দুর্গার সিংহ আর তা ছাড়া ডিটেকটিভ স্বয়ংও তো হামাগুড়ি দেয়।'

আমি বললাম.'আমাকে বরং ডিটেকটিভ কর না।'

গণেশ একটু হাসল, 'ওটা তোকে দিয়ে হবে না। ওতে অনেক জানতে হয়, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স লাগে। তাই ডিটেকটিভটা আমাকেই হতে হবে।'

কথাগুলো অবশ্য বাজে বলেনি গণেশ। গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধে গণেশের অগাধ জ্ঞান। যত রকমের রহস্য উপন্যাস বাজারে পাওয়া যায় সবই গণেশের নখদর্পণে। মাঝে মধ্যেই গণেশ আমাদের তা থেকে রোমহর্ষক জায়গাগুলো পড়ে শোনায়। কোথাও গোয়েন্দা বারোতলা বাড়ির ছাদ থেকে একহাতে ঝুলতে ঝুলতে আততায়ীকে খামচে দিচ্ছে, কোথাও গোলাবারুদের বৃষ্টির ভেতর গোয়েন্দা এমন ডিগবাজি খাচ্ছে যে একটাও গুলি গোয়েন্দার গায়ে লাগছে না, আরও কতো রকম। তা ছাড়া গোয়েন্দা হবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যারাটে-ফ্যারাটের মতন হরেকরকম কসরত গণেশের জানা।

গণেশ বললো, 'অভিজ্ঞতা দেখবি?'

আমি দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হলাম। গণেশ ঘাড় বেঁকিয়ে আড়চোখে চাইল, 'তুই আজ সকালে সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছিস। তাতে তোর ডান পায়ের হাঁটুর একটু নীচে কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'একটু রং নাম্বার হলো গণেশ। আমি আজ সকালে ট্রামে চড়ে সাঁতার কাটতে গেছি। প্যান্টের হাঁটুর কাছে, ওটা রক্তের দাগ না! একটা লোক পানের পিক ফেলেছে তারই দাগ।'

গণেশের মুখটা একটু ভারি দেখাল। বললো, 'চিরুনিটা দেখি।' চিরুনিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে গণেশ বললো, এটা যে দোকানে কেনা সেই দোকানীর সামনের দুটো দাঁত নেই, মাথায় টাক আর ডান ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ আছে।

আমি এবার মুগ্ধ না হয়ে পারি না। একটা চিরুনি দেখে দোকানী সম্বন্ধে এত

কথা বলা সত্যি প্রচুর অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। চিরুনিটা আমি টেনে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। না! অসম্ভব!!

পাঞ্জাবির পকেট থেকে পটাং করে একটা বই টেনে বার করল গণেশ। বইটার নাম 'সরল গোয়েন্দাগিরি'। আমি বইটা ছোঁ মারবার জন্যে হাত বাড়ালাম। গণেশ টপ্ করে বইটা পকেটে পুরে ফেলে বলল, 'ধীরে। ডিটেকটিভদের প্রথম কর্তব্য উত্তেজিত না হওয়া।'

গোয়েন্দার পদের জায়গায় শাগরেদের পদটা গ্রহণ করা ঠিক হবে কিনা মনে মনে ভাবছিলাম। গণেশ বলে চলল, 'তোকে দিয়ে শাগরেদের কাজটা বেশ ভালো চলে যাবে। তুই খুব ভালো দৌড়তে পারিস। আমার থেকেও ভালো। আততায়ীর সামনে বা পেছনে ওটা খুবই জরুরী।'

আমি একটু খুশি না হয়ে পারি না, 'আততায়ীর পেছনেটা বোঝা গেল কিন্তু আততায়ীর সামনেটা...........'

'আততায়ী যদি খুব ষণ্ডামার্কা হয় আর তাড়া করে, সে ক্ষেত্রে আততায়ী পেছনেই তো থাকবে।' বুঝিয়ে দেয় গণেশ 'তা ছাড়া তোর মতন একটু বোকাসোকা শাগরেদ হলেই ভালো। তোকে সব দেখেশুনে একটু ভুল বলতে হবে, তখন আমি তোর ভুলগুলো ভেঙে দেব।'

এবার গণেশের কথায় আমার খুব রাগ ধরে গেল। মনে মনে বললাম, 'তোর কত বুদ্ধি তা আমার জানা আছে। কালও অঙ্কের ক্লাস দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিস।'

আমার মুখ দেখে গণেশ বলল, 'আহা চটছিস কেন? গোয়েন্দা দলের ওটাই দস্তুর। ধর, আমরা তদন্ত করতে গেছি, দেখলাম খুনী একটা সিগারেটের টুকরো ফেলে গেছে। এমনি লোক হয়তো চিনতে পারত, কিন্তু গোয়েন্দার শাগরেদ মানে তুই ওটাকে বিড়ি বা পেন্সিল বা অন্য কিছু ভাববি। আমি তখন বুঝিয়ে বলব—ওটা বিড়ি বা পেন্সিল নয় হে, ওটা আধপোড়া সিগারেট। আমার ভারতে তৈরি পঞ্চাশ রকমের সিগারেটের সঙ্গে পরিচয় আছে....।

'পোশাকআসাক সম্বন্ধে কতগুলো কড়া নিয়ম পালন করতেই হয় গোয়েন্দাদের।' বলে চলে গণেশ—'একটা বর্ষাতি আর একটা চোখ-অবধি নামানো টুপি পরতেই হয়। যেগুলো ছদ্মবেশ ধারণ না করলে কিছুতেই খুলতে পাবি না গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভূমিকম্প, পেটফাঁপা কিছুতেই না।'

আমি মনে মনে পরিস্থিতিটা কল্পনায় চেষ্টা করি, 'ছদ্মবেশের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল।'

'এটা বুঝছিস না। আততায়ীকে ফলো করার সময় বেদুইন, ভবঘুরে, হনুমান, মনুমেন্ট এই ধরনের কিছু সেজে নিতে হয় যাতে আততায়ী মোটে টেরটি না পায়। কি? গোয়েন্দার শাগরেদ হতে রাজী?' জিজ্ঞেস করে গণেশ।

আমি বলি, 'একটা দিন ভাববার সময় দিবি তো?'

গণেশ বলে, 'এক ঘণ্টাও না। তুই আমার এত বন্ধু বলে তোকেই প্রথম অফারটা দিচ্ছি। তুই রাজী না হলে অনেক লোক আছে। হাতের সামনে কেস হাজির—আসামী ধরতে পারলে অনেক টাকা। নষ্ট করার সময় একটুও নেই। আমি অনেকদূর ভেবে এসেছি তুই রাজী হলেই এক্ষুণি বলব।'

আমি বললাম, 'রাজী।'

গণেশ বলল, 'ওরকমভাবে রাজী হলে হবে না। একটা ভালো সাদা কাগজ নিয়ে আয়।'

আমি একটা কাগজ নিয়ে এলাম। তাতে গণেশ ওপরে নিজের নাম লিখে পাশে লিখল ওরফে চুপিচুপি। তার তলায় আমার নাম লিখে পাশে লিখল ওরফে গুপ্ত। কাগজটার প্রায় নিচের কাছাকাছি লিখল 'চুপি চুপি গুপ্ত এণ্ড কোং।' বুকপকেট থেকে একটা আলপিন বার করল গণেশ। নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে সেটা ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বার করে নিজের নামের পাশে একটা টিপছাপ দিল। আমি বিষিয়ে যাবার ভয়ে আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু লজ্জাই করল। আঙুলে পিন ফুটিয়ে টিপছাপ দিয়ে কাগজটা গণেশের দিকে এগিয়ে দিলাম।

গণেশ বলল, 'আজ থেকে আমি গোয়েন্দা 'চুপিচুপি' আর তুই আমার শাগরেদ 'গুপ্ত'। আমাদের সংস্থার নাম 'চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং'।'

আমি মুগ্ধ—'তোর এলেম আছে গণেশ। দারুণ নাম দিয়েছিস। কে বুঝবে গোয়েন্দার বাসা। লোকে ভাববে মুদিখানা। কিন্তু একটা কথা বলবি, কি করে চিরুনি দেখে বুঝলি দোকানীর চেহারা?'

গণেশ বলল, 'বাজে বকার সময় নেই। এক্ষুণি কেসের পেছনে ছুটতে হবে। নেহাৎ শুনতে চাইছিস যখন বলছি। ও চিরুনিটা আমার সেজদার ফ্যাক্টরির মাল। বাজে বলে এ তল্লাটে কেউ রাখে না একমাত্র অরিন্দম স্টোরস্ ছাড়া। ওর মালিকের.....।'

আমি বললাম, 'ও!'

গণেশ আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'এক মিনিটও নষ্ট করার নেই। এক্ষুণি মোড়ের মাথায় পোস্ট অফিসে যেতে হবে।'

আমরা যখন পোস্ট অফিসে পৌছলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। প্রচুর লোকের ভিড়। তার ভেতর দিয়ে গণেশ আমাকে হিড়হিড় করে শেষ প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, 'ভালো করে চেয়ে দেখ।'

আমি বললাম, 'ফিসফিস করে বলছিস কেন? পোস্ট অফিসে টাকা রাখলে সুবিধের কথা লেখা। এ তো সব পোস্ট অফিসেই থাকে।'

গণেশ এবার আমার প্রায় কানে কানে বলল, 'আঃ, তার পাশের ছবিটা দেখ।'

আমি দেখলাম পাশেই একটা লোকের বুক পর্যন্ত ছবি। ফটোগ্রাফ নয়। হাতে

আঁকা ছবির কপি। তলায় লেখা—'সন্ধান দিতে পারলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।'

গণেশ বলল, 'চিনতে পারছিস?'

আমি একটু চটে গেলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ পারছি। পুরুষ মানুষের ছবি। পরিষ্কারই তো বোঝা যাচ্ছে।'

'আঃ! বোকামো করিস না। লোকটাকে চিনতে পারছিস?'

'কেন তুই-ই তো একটু বোকামো করতে বলেছিস।'

আমার কানে প্রায় মুখ ঢুকিয়ে দিল গণেশ, 'আঃ, সে সব পরে।'

আমি ভালো করে ছবিটাকে নিরীক্ষণ করলাম। মুখটা সত্যিই খুব চেনা, অনেকবার দেখেছি। মুহূর্তে গণেশের অনেকগুলো কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। এটাই আমাদের, মানে 'চুপিচুপি গুপ্ত'র প্রথম কেস। ছবিটা দেখে আগেভাগে কেউ যদি পুরস্কারটা পেয়ে যায়, তাই গণেশের এত তাড়া।

গণেশ বলল, 'এটা পুলিসের আর্টিস্টের আঁকা ক্রিমিনালের ছবি। ওরা, যে লোক ঠাঙানি খায় বা মারা যায় তার মৌখিক বিবরণ থেকে আঁকে। তাই ছবিটা বেশির ভাগ সময় একটু অসম্পূর্ণ থাকে। লোকটা আমাদের ভীষণ দেখা। ওই অসম্পূর্ণতার জন্য কিছুতেই ঠিক ঠিক চিনতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছিস। ভীষণ চেনা—ভেবে বার করতেই হবে। এটা আমাদের প্রথম কেস আর অনেকগুলো টাকা।'

'একটা কথা কিন্তু মনে রাখিস। আমাদের ইস্কুলের মদন আর দেবাশিসও একটা গোয়েন্দা দল গোছের করেছে। এই ছবিটার কপি সামনের ব্যাঙ্কেও আছে। আমি ওদের কাল সকালে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দেরি মোটেই করা চলবে না।' গণেশের গলায় উদ্বেগ।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। খুব চেনা মুখ, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না, লোকটা সঠিক কে!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে গণেশ ভারি গলায় বলল, 'গুপ্ত, আততায়ী আমাদের কাছেই আছে—খুঁজে বার করা চাই।'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, তোমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার উজাড় করতে কসুর করো না। প্রয়োজনে 'সরল গোয়েন্দাগিরি'র উপদেশগুলো ঝালিয়ে নিও।'

ঘরের ভেতর একটা ঝিঁঝিপোকা ডাকলে যে অবস্থা হয়, আমার মনের অবস্থাটা ঠিক সেইরকম হল। ঝিঁঝি পোকাটা ঘরের ভেতরেই যে ডাকছে সেটা জানা, কিন্তু কোথায় আছে সেটা কিছুতেই ঠাহর হয় না। পোস্ট অফিসে দেখা প্রতিকৃতিটা মনের আনাচে কানাচে ক্রমাগত নেচে বেড়াতেই থাকল। বহু চেনা হলেও লোকটা যে কে সেটা কিছুতেই মগজে এল না।

বাকি দিনটা ভেবেই কাটালাম। খেতে খেতে ভাবলাম, শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কান চুলকোতে চুলকোতে ভাবলাম, খেলার মাঠে গিয়ে ভাবলাম কিন্তু কোনও হদিস নেই। বারবার গণেশের কথাটা মনে হল। কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে......

রাত্রে যখন খেতে বসলাম, মা বলল, কিরে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? জ্বরটর আসেনি তো?

আমি আর সেজদা এক খাটে শুই। সারারাত শুধু চিত হলাম, উপুড় হলাম, যত ধরনের কাত হওয়া যায় সব হলাম। মনের প্রতিকৃতিটার সঙ্গে চেনাশোনা সব মুখগুলো একবার করে মেলালাম। ছোটকাকীমার থেকে শুরু করে স্কুলের হেডস্যার পর্যন্ত। সেজদা নাকডাকা বন্ধ করে একবার বলল, 'ওরকম ছটফট করছিস কেন? ছারপোকা কামড়াচ্ছে?'

প্রত্যেকটা রাত যে কত লম্বা, তা জেগে না থাকলে বোঝা যায় না। যখন কারুর সঙ্গেই মিলল না তখন মনের প্রতিকৃতিটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা শুরু করলাম। একটার পর একটা ট্রাই করে চললাম। মাথায় ঘোমটা, নাকে, গোঁফের সঙ্গে নথ, কপালে টিপ ইত্যাদি লাগিয়ে চেনা মুখের সঙ্গে মেলাতে থাকলাম। ভোরের আলো যখন প্রায় ফুটিফুটি তখন হঠাৎ আমার সারা শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। পাছে ভুল হয় তাই আবার মেলালাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার মেলালাম। আবার ঠিক। স্বপ্ন দেখছি না তো। সেজদাকে একটা চিমটি কেটে দেখলাম। না, জেগে আছি। চিমটিটা ঠিকই কেটেছি। চিমটি কাটলে বোঝা যায় জেগে আছি না ঘুমিয়ে। সেজদা চিমটি খেয়ে 'ঘ্যাঁও' বলে লাফিয়ে উঠে আমার দিকে তাকাল। মুখ দেখে মনে হল ঠিক বুঝতে পারছে না। চিমটিটা স্বপ্নের না বাইরের জগতের।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, 'পেয়ে গেছি' বলে উল্লাসে সেজদাকেই জড়িয়ে ধরলাম।

সেজদা একটা 'ঘোঁৎ' করে আওয়াজ ছেড়ে বলল, 'গুচ্ছের ক্রিমি হয়েছে পেটে, কাল সকালেই মাকে বলব তোকে ওষুধ দিতে।'

সাফল্যের আনন্দ-সমুদ্রে হাবুডুবুর ভেতর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল বেলা ন'টায়। মুখটা কোনোক্রমে ধুয়ে এক দৌড়ে হাজির হলাম গণেশের বাড়ি।

গণেশ ওদের বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে একমনে পা দোলাচ্ছিল। চেহারাট অনেকটা খাণ্ডবদাহনে পড়া ঝুলঝাড়ার মতন। দেখলেই বোঝা যায় সারারাত মোট্টেই ঘুমোয়নি।

আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে কায়দা করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোয়েন্দা চুপিচুপির কী খবর? রহস্যের সমাধান কিছু মিলল?'

গণেশের গলা বেশ ম্রিয়মান, 'মিল তো প্রথম থেকেই পাচ্ছি গুপ্ত, কিন্তু পাকা খবর কিছুই নেই। অনেক রকম করে ভেবেছি—সোজা হয়ে, ব্যাঁকা হয়ে, এমনকি

একটা পুরোনো পাইপ জোগাড় করে ভাববার সময় কপালে ঘষে দেখেছি, ঠিক যেমনটা ডিটেকটিভরা করে—কিন্তু কোথায় কি!' শীতের উত্তুরে বাতাসের মতন একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গণেশের মুখ দিয়ে।

আমি গোয়েন্দাসুলভ কায়দামাফিক গলা নামিয়ে বললাম, 'পাকা খবর আমার কাছে আছে হে চুপিচুপি, কষ্ট করে একবার শুধু পোস্ট অফিসে ছবিটার কাছে যেতে হবে।'

গণেশ আমাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না দেখে আমি গণেশের নড়া ধরে এক হ্যাঁচকা টানে রোয়াক থেকে তুলে বললাম, 'নষ্ট করার সময় মোটেই নেই চুপিচুপি।'

পোস্ট অফিসে অত সকালেই দিব্যি লোকের ভিড় জমে গেছে। তার মাঝখান দিয়ে আমি গণেশকে টেনে নিয়ে গেলাম সেই ছবিটার সামনে। পকেটে করে আমি একটা মোটা স্কেচ পেন নিতে ভুলিনি। ঝটপট বার করে ছবিটায় একটা মোটা গোঁফ লাগিয়ে দিলাম—'এখন কি আর চিনতে অসুবিধে হচ্ছে? গোয়েন্দা প্রবর?' প্রবর কথাটার মানে আমার অজানা, কিন্তু কথাটা এরকম জায়গাতেই ব্যবহার হয় আর ওটা যে গণেশের অজানা সেটাও আমার জানা।

গণেশ গোঁফ লাগানো ছবিটার দিকে মিনিট কয়েক তাকিয়ে থাকল, তারপর উল্লাসে স্বভাবসুলভ (ক্যারাটে সুলভও বলা চলে) 'ইয়াং ফুঃ' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সাবাস গুপ্ত. তোমার জবাব নেই। তুমি একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হতে পারবে নিশ্চয়ই।'

আমিও আহ্লাদে ডগমগ, কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে রইলাম। সম্বিত ফিরল এক বৃদ্ধের হুংকারে, 'কী সব অসভ্য ছেলেপুলে হয়েছে আজকাল.....।' তাকিয়ে দেখি ভিড়ের ভেতর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের জাপটা-জাপটির মাঝে পড়ে গেছেন।

গণেশ বলল, 'কী সাংঘাতিক! এ তো তপনের সেজকাকা! লোকটাকে দেখলে তো ভিজে বেড়াল মনে হয়। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু তুমি একটা বিপদ বাধালে গুপ্ত। এত লোকের ভিড়ে এই ছবিটাতে গোঁফ লাগালে? সব্বাই দেখবে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার আর আততায়ী থাকে একশো গজের ভেতর।'

গতকাল বোকা বলার রাগটা আমার পোষাই ছিল। একহাত বদলা নিলাম, 'দরকার হতো না হে চুপিচুপি, তোমার মাথায় আর একটু ঘিলু থাকলে। গোঁফ ছাড়াই চিনতে। ছবিটা ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা করব?'

গণেশ উত্তেজনায় অপমানটাও গায়ে মাখল না, 'মন্দ হয় না।'

আমরা ছবিটা দেওয়াল থেকে তুলতে গিয়ে দেখলাম খুব মজবুত আঠা দিয়ে সাঁটা। খুঁটে খুঁটে তুলতে হবে। তা ছাড়া হরেক ধরনের লোক কটমট করে তাকিয়ে আছে। হয়তো আততায়ীর আত্মীয় বলে চালান করে দেবে। গণেশ গজগজ করতে থাকে, 'কী দরকার এত ভালো আঠা দিয়ে সাঁটার। খাম, ইনল্যান্ডের মতন আঠা দিলে কত্তো সহজে উঠে যেত......।'

ছবিটা তোলা গেল না। আমি বললাম, 'চুপিচুপি, এই পোস্ট অফিসের অন্ধকার কোণে কজনই বা দেখবে। তা ছাড়া আমরা যদি সময় নষ্ট না করে পুলিসে খবরটা পৌঁছে দিতে পারি তাহলে তো.....'

গণেশ দেখলাম আমাকে একটু ধর্তব্যের ভেতর আনছে, 'তা ঠিক। কিন্তু গোয়েন্দার পরের পদক্ষেপ হলো আততায়ীর সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করা। খায় কিনা, কেন খায়, দাঁত মাজে কিনা, কখন ঘুম থেকে ওঠে, কেন ওঠে ইত্যাদি যত খবর আমরা রাখব ততই সুবিধে।'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, খবরের বেশ খানিকটা আমাদের জানা। সেজকাকা দাড়ি কামায়, খাওয়াদাওয়া করে, ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে, কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, সবই জানা। কিন্তু কোন কাজটা যে কেন করে মানে কেন বাড়ি ফেরে, কখন ঘুমোয়, কেন ঘুমোয় এগুলো জানতে হবে বৈকি।'

গণেশ দেখলাম আমাকে শাগরেদ হিসেবে শুধু বিশ্বাসই না, প্রচুর শ্রদ্ধাও করছে। অবশ্য বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় প্রচুর মিল আছে। তালব্য 'শ' ছাড়াও। গণেশ ভাবতে ভাবতে বলল, 'শুধুই কি এই?'

আমি বললাম, 'আর কিছু বাকি থাকলে পরে দেখা যাবে।'

গণেশ বলল, 'লোকটাকে আমার বরাবরই বেশ সন্দেহজনক লাগতো। এখন

দেখছি হুবহু মিলে যাচ্ছে। খবরগুলো পাওয়া তেমন শক্ত হবে না। তপনদের বাড়ির সামনের ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে আমাদের অবাধ গতি। আজ রাতে একটু নজর রাখলেই অনেক জানা যাবে। তপনের সেজকাকার ঘরটা তো রাস্তার ওপর। কিন্তু গোঁফ লাগানো ছবিটা পোস্ট অফিসে থেকেই গেল। গতকাল সন্ধ্যেয় আমি ওখানে বেশ ভিড় দেখেছি। দু'একজন এঁকেও নিচ্ছিল। পাঁচ হাজার টাকা বলে কথা।'

বাড়িতে কোনোভাবে ম্যানেজ করে সন্ধ্যে আটটার পর থেকে আমরা ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে বসে। নিজেদের পাড়ায় নতুন মানুষ পেয়ে মশারা মশগুল। আমি একটা মশাকে চটাস করে মারাতে গণেশ বলল, 'অতো জোরে মশা মারে না গুপ্ত। ফিসফিস করে মারো।'

আমি প্রতিবাদ করলাম। আততায়ীর ঘরের সঙ্গে এখনও অন্তত চল্লিশ ফিটের ফারাক। তা ছাড়া আততায়ীর যখন পাত্তা নেই। গণেশ বুঝিয়ে বলল, 'এটা গোয়েন্দাদের কর্তব্য। আওয়াজ করে মশা মারা তো দূরের কথা, এই সময়ে সরল গোয়েন্দাগিরির মতে আওয়াজ করে কান চুলকোনো পর্যন্ত মানা।'

ফিসফিস করে মশা মারা কি সহজ কাজ.....

বসে আছি তো আছিই। যখন মশার দল প্রচুর খেয়ে বেসুরো গান গাইছে, যখন চাঁদ মাথার ওপর দিয়ে ওপাশে চলে গেছে, যখন আমি প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছি তখন হঠাৎ গণেশের খোঁচায় সংবিৎ ফিরে এল, 'একটা গাড়ি এইমাত্র কাউকে যেন নামিয়ে দিয়ে গেল।'

সেজকাকার ঘরটা আমাদের চেনা। — আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম এক গেরুয়া পরা রুদ্রাক্ষধারী কাপালিক সেঁধিয়েছে সেখানে। আমি গণেশকে টিপতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু তার আগেই রুদ্রাক্ষ আলখাল্লা, নিবিড় চুল দাড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করে জেগে উঠলেন তপনের সেজকাকা। এই সময় আমি আমার মশার কামড়ে চিত্রিত হাতে গণেশের হাত অনুভব করলাম। যা দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির। সেজকাকা, পরনের গেরুয়া পাজামা থেকে টেনে বার করলেন একটা ছ'ঘরা রিভলভার। সত্যি বলছি, আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে দুটো মশা চিবিয়ে ফেললাম।

গণেশ বলল, 'দেখেছিস?'

সেজকাকা রিভলভারটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। গণেশ আবার বলল, 'ডাকাতি সেরে ফিরল মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'যা যা জানার ছিল জানা গেছে তো। বাড়ি চল। কাল সকালে থানায়!'

গণেশ বলল, 'সকালে নয়। গোয়েন্দার কর্তব্য সকালে আততায়ী সম্বন্ধে আরও বেশি খোঁজ নেওয়া। এক্ষেত্রে অবশ্য সহকারী নিষ্প্রয়োজন। তোর বাড়ি আসব। সন্ধ্যে বেলা। তারপর থানায় যাব।'

গণেশের সময়জ্ঞান আছে বলতেই হয়। সন্ধ্যে সাতটার সময় এল। হাতে হাত ঘষে, শরীরটা পেছন দিকে এলিয়ে একটা হাই তুলল গণেশ। 'আর কোনও সন্দেহই নেই—আততায়ী আর পাঁচ হাজার আমাদের হাতের মুঠোয়। এখন খালি ছিপে ধরা মাছ ডাঙায় তোলা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে চুপিচুপি, কী এমন সংবাদ পেলে?'

গণেশ বলল, 'সংবাদ পেলাম না। সেটাই তো সংবাদ। তপনকে হাজার প্রশ্ন করাতেও কিছুই বলল না। বলল, 'বলা বারণ।'

আমরা থানার কাছেই থাকি, তবে কপালগুণে তেমন যাতায়াত নেই। থানায় লোক গমগম করছে। একপাল লোক দাঁড়িয়ে আছে আর থানার বড়বাবু তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। গণেশ কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, সামনের কনস্টেবলটা ওকে থামিয়ে দিয়ে চুপিচুপি বলল, 'আস্তে — চেঁচাবেন না। ডি সি ডি ডি নিজে এসেছেন একটা কেসের ব্যাপারে খবর করতে। পাশের ঘরে বসে আছেন। বড়বাবুর প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরের পর নিজে জেরা করবেন। থানার সকলে মায় বড়বাবু অবধি তটস্থ।'

গণেশ আমার কানে কানে বলল, 'ডি ডি মানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু ডি সি মানে কী কে জানে।'

আমি বললাম, 'আরে ইলেকট্রিকের যেমন এ সি, ডি সি থাকে ডিটেকটিভদেরও থাকতেই পারে।'

কনস্টেবলটা আমাদের চাপা স্বরে বলল, 'আরে তা না। ডি সি মানে ডিপুটি কমিশনার।'

গণেশ মুগ্ধ। পকেট থেকে সট্ করে একটা নোটবই বার করল, 'গুপ্ত অনেক ভাগ্য করলে এমন লোকের সাক্ষাৎ মেলে। জেরার ধরনটা নোট করে রাখতেই হবে। কাজে লাগবে।'

আমি বললাম, 'আমরা ভাগ্যবান হে চুপিচুপি। ডি সি ডি ডি-কেই সটান জানাব তদন্তের ফল।'

বড়োবাবু লোকটি অনেকটা প্রাইমারি স্কুলের বাঘাটে হেডস্যারের মতন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর সামনে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন শক্ত, গলা নরম।

বড়বাবু বললেন, 'পুরস্কারটা তাহলে পুরো পনেরোজনকেই ভাগ করে দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকেদের ভেতর একটা হুটোপাটি লাগল, 'কেন স্যার আমি প্রথম। না আমি আগে। আমি তারও আগে, আমরা তো সেই সকালবেলা.....'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, সরকার মনে হচ্ছে বেশ উদার। সব কেসেই পুরস্কার দিচ্ছে।'

'দেখেছ গুপ্ত', হাসল গণেশ 'আমরা তাড়াহুড়ো না করলে আমাদের কেসের বেলাতেও ওই অবস্থাই হত।'

বড়োবাবু বললেন, 'আপনাদের ভেতর যারা ওই ছবিটাতে গোঁফ এঁকেছেন তাঁদেরই কিন্তু পুরস্কারটা পাবার কথা।'

মুহূর্তে তিনটে হাত উঠল আকাশে, সমবেত, 'আমি স্যার।'

ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হতে পাক্কা তিরিশ সেকেন্ড লাগল। ছবিটা সেই পোস্ট অফিসের ছবি। মানে আমাদের আততায়ীর। আমি লাফিয়ে উঠে বলতে যাচ্ছিলাম, ওটা আমার আঁকা। পুরস্কারটা আমাদের.....কিন্তু গণেশ আমাকে জাপটে ধরে বলল, 'দেরি হয়ে গেছে গুপ্ত। সরল গোয়েন্দাগিরির মতে......'

রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ে গেল সেই কাতর রাতজাগা।

বড়োবাবু হাঁকলেন, 'স্যার, এই নিন আপনার পুরস্কার দেবার লোক।'

চকিতে ঘরে ঢুকলেন ডি সি ডি ডি। ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল, 'ল.......ক আপ্। তিনটেকেই।'

ডি সি ডি ডি-কে দেখে আমি এমন চমকে উঠলাম যে পাশের টুলে বসে থাকা কনস্টেবলের কোলে ধপ্ করে বসে পড়লাম। এ তো স্বয়ং তপনের সেজকাকা!

কনস্টেবলটা ফিসফিস করে আর্তনাদ করল, 'আই বাপ্।'

গণেশের মুখের দিকে তাকালাম, গণেশ পুরো স্ট্যাচু। নাকের ওপরে একটা মশা একমনে রক্ত খেয়ে চলেছে।

সেজকাকা বলে চললেন, 'পুরস্কারের লোভ দেখানো খুনীর ছবিটায় আমার সঙ্গে মিল ছিল। এই হতভাগাগুলো তার ওপরে গোঁফ বসিয়ে এক্কেরে আমার ছবি বানিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে লোকে আর টেলিফোনে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। গোঁফটা কামিয়েই ফেললাম। কিন্তু তাতেও কী রেহাই আছে! যারা গোঁফ ছাড়া ছবিটা দেখেছে তাদের দল পড়ল পেছনে।'

হঠাৎ সেজকাকা ফিরলেন আমাদের দিকে। আমাদের দেখে বেশ ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন, 'তোদের আবার কি চাই এখানে?'

আমি আবার চমকে সেপায়ের কোলে বসে পড়ছিলাম প্রায। কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি দেখাল গণেশ, 'সেজকা, কালকে কালীপুজো! চাঁদাটা. ..'

ডি সি ডি ডি বললেন, 'কাল সকালে বাড়িতে আসিস। এখন পালা।'

আমরা থানার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গণেশ বলল, 'গুপ্ত, গোয়েন্দাদের পরের কর্তব্য.....'

আমি বললাম, 'ছুট লাগানো।'

ছুটতে ছুটতে গণেশ বলল, 'হতাশ হয়ো না গুপ্ত। পরের কেস নাকেব ডগায় ঝুলছে। ও টাকাটা পাবই।'